হেঁয়ালি নাট্য। *

ছাত্র শ্রী মধুসূদন। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাষ্টার পড়াইতেছেন।

অভিভাবকের প্রবেশ।

অভিভাবক। মধুসূদন পড়াশুনো কেমন করচে কালাচাঁদ বাবু?

কালা। আজ্ঞে, মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজ্‌বুৎ। কখনো একবার বৈ দুবার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখন ভোলে না।

অভি। বটে? তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌ব।

কালা। তা দেখুন্ না।

মধুসূদন। (স্বগত) কাল মাষ্টার মশায় এমন মার মেরেচেন যে আজও পিট চচ্চড় করচে। আজ এর শোধ তুল্‌ব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভি। কেমনরে মোধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে ত?

মধু। মাষ্টার মশায় যা বলে দিয়েচেন তা সব মনে আছে।

অভি। আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কা'কে বলে বল্‌দেখি?

মধু। যা' মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভি। একটা উদাহরণ দে।

মধু। কেঁচো।

কালা। (চোক রাঙাইয়া) অ্যাঁ! কি বল্লি!

অভি। রযুন্ মশায়, এখন কিছু বল্‌বেন না। (মধুসূদনের প্রতি) তুমি ত পদ্যপাঠ পড়েছ, আচ্ছা, কাননে কি ফোটে বল দেখি?

মধু। কাঁটা। (কালাচাঁদের বেত্র আস্ফালন) কি মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌চি?

অভি। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কি বলে?

মধুসূদন। পোকায়। (বেত্রাঘাত) আজ্ঞে মিছিমিছি মারখেয়ে মরচি—শুধু সিরাজ-উদ্দৌলা কেন সমস্ত ইতিহাস খানাই পোকায় কেটেচে! এই দেখুন। (প্রদর্শন) (কালাচাঁদ মাষ্টারের মাথা চুল্‌কায়ন)।

অভি। ব্যাকরণ মনে আছে?

মধু। আছে।

---

* গতবারের হেঁয়ালি-নাট্যের উত্তর "ডানপিটে।" বাঁকিপুর হইতে বাবু শরৎচন্দ্র দত্ত ও কলিকাতা হইতে বাবু গুরুদাস আঢ্য উত্তর পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অভি। কৰ্ত্তা কি, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধু। আজ্ঞে কৰ্ত্তা, ওপাড়ার জয়মুন্সি।

অভি। কেন বল দেখি।

মধু। তিনি ক্রিয়া কর্ম্ম নিয়ে থাকেন।

কালা। (সরোষে) তোমার মাথা। (পৃষ্ঠে বেত্র)

মধু। (চমকিয়া) আজ্ঞে, মাথা নয়, ওটা পিট।

অভি। ষষ্ঠ তৎপুরুষ কা'কে বলে?

মধু। জানিনে।

কালাচাঁদ বাবুর বেত্র দর্শায়ন।

মধুসূদন। ওটা বিলক্ষণ জানি—ওটা যষ্টি-তৎপুরুষ।

(অভিভাবকের হাস্য এবং কালাচাঁদ বাবুর তদ্বিপরীত ভাব।)

অভি। অঙ্ক শিক্ষা হয়েছে?

মধু। হয়েছে।

অভি। আচ্ছা। তোমাকে সাড়ে ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকী থাকবে তোমার ছোট ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার ছমিনিট লাগে, কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধু। একটাও নয়।

কালা। কেমন করে!

মধু। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভি। আচ্ছা একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয় তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে।

মধু। যদি সে গাছ বেঁকে যায় তাহলে ঠিক বলতে পারিনে, যদি বরাবর সিদে ওঠে তা হলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তা হলেত কথাই নেই।

কালা। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিট লাল করব তবে তুমি সিধে হবে!

মধু। আজ্ঞে সে ভাল উপায় নয়, মারের চোটে খুব সীধে জিনিষও বেঁকে যায়।

অভি। কালাচাঁদ বাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। মারপিট করে লেখাপড়া হয় না। কথা আছে গাধাকে পিট্‌লে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিট্‌লে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে কিন্তু অধিকাংশ মাষ্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি

আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিনকতক মধুসূদনের পিট জুড়োক্ তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধু। (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল।

কান্না। বাঁচা গেল মশায়। এ ছেলেকে পড়ান মজুরের কর্ম্ম, কেবল মাত্র Manual labour। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই [illegible] গাছ কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।

পরীক্ষা।

(বালিকার রচনা)

জ্যৈষ্ঠ মাসের বালকে "লাঠির উপর লাঠী" লেখক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। তিনি বলিয়াছেন "মেয়েরা যে লেখা পড়া করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না।" লেখক মহাশয়ের যদি বিশ্বাস হয় যে কেবল চাকরীর জন্যই পরীক্ষা দেওয়া তাহা হইলে এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও কিছুই নাই। কিন্তু পরীক্ষা দিবার ত আরও অনেক রকম উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। আমি যতদূর জানি তাহাতে ত মনে হয়, যে বিদ্যাশিক্ষা করাই মেয়েদের পরীক্ষা দিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। লেখক মহাশয় বলিতে পারেন যে বিদ্যা শিক্ষাই যদি পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহারা ত ঘরেই কিম্বা স্কুলেও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন। পরীক্ষা দিবার ত কোন দরকার নাই। প্রথমে তাঁহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই।

প্রশ্ন। ঘরেই ত বিদ্যাশিক্ষা হয়।

উত্তর। শিখাইবে কে? লেখক মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহাদের [illegible] অন্ন যে পড়িয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। তবে তাঁহারা তাঁহাদের [illegible] অন্য কাহাকেও, এক মিনিট সময়ও বা কিরূপে দিতে পারিবেন? আর [illegible] বা সময় কোথা, তিনি এক সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের পর আবার কাহাকে [illegible] পড়াইতে পারেন? আর বাটীর অন্য সকলেই নিজের নিজের কার্য্যে ব্যস্ত। [illegible] পারেন না। তবে বলিতে পারেন যে ঘরে ত মাষ্টার রাখিয়া পড়াইলেই হয়। তাহাতে ত এক সোজা বাধা পড়িয়াই রহিয়াছে—টাকার অভাব। ঘরে মাষ্টার রাখিতে গেলে [illegible] দশটা করিয়া টাকা মাসে মাসে দেওয়া চাই। কিন্তু যাঁহারা দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া [illegible]

করিতে পারেন না, তাঁহারা কিরূপে অতগুলি টাকা দিয়া একটী মাষ্টার রাখিবেন। এত গেল দরিদ্র ঘরে কথা। এখন ধনীদের কথা বলা যাউক। তাঁহারাই বটে কিছু করিলেও করিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বাড়ীর মেয়েদের জন্য মাহিনা দেওয়া মাষ্টার বা শিক্ষিতা মহিলা রাখিতে পারেন। কিম্বা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা নিজেই পড়াইতে পারেন, কারণ তাঁহাদের ত আর কাজ-কর্ম্ম করিতে হয় না।

আমাদের দেশের প্রত্যেক ধনীই যদি এরূপ করেন ত দেশের অনেক উন্নতি হয়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই।

প্রশ্ন—ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা হইতে পারে, পরীক্ষা দিবার কোন দরকার নাই।

উত্তর—সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় গুলিতে যাহাতে সকলেই প্রবেশ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যই আজ-কাল য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষণীয় বিষয়-গুলির শিক্ষা প্রবর্ত্তনা করা হইয়াছে, এবং আজ-কালকার ইস্কুলেও ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েরা যদি স্কুলে পড়িতে যান তাহাহইলে তাঁহাদের স্কুলের নিয়ম অনুসারে পড়িতে হইবে। তবে য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি পড়া যায়—অথচ পরীক্ষা না দেওয়া যায় তাহাতে কোন লাভ হইবে না, বরং ক্ষতি হইতে পারে কারণ য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষার্থিণী হইলে এই ফল হয় যে আমি জানিতে পারি যে ইহার জন্য যেমন-তেমন করিয়া পড়িলে চলিবে না, আর অনুত্তীর্ণ হইলে যে কি হৃদয়-বিদারক লজ্জা ও নিরাশা পাইতে হইবে তাহা জানি, তাহা যাহাতে না পাইতে হয়—যাহাতে শুদ্ধ উত্তীর্ণ না—ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারি এরূপ করিয়া পড়িতে হইবে। * তবে এরূপ পড়াতে আর পরীক্ষা না দেওয়ার পড়াতে কি কোনই প্রভেদ নাই?—পরীক্ষা যদি না দিই অথচ সেই বইগুলিই পড়ি, তাহা হইলে মনে হইবে পরীক্ষা ত আর দিব না তবে আর বেশী পড়িয়া কি হইবে?—একরকম মোটামুটি জানিয়া রাখিলেই হইবে। কিন্তু একি ভ্রম! যখন এক খানা বই পড়িতেছি, তখন সেটা ভাল করিয়া না পড়িয়াই ছাড়িয়া দিব?—যাহা একবার পড়িতে ধরিব সেটা কণ্ঠস্থ করিয়া তবে ছাড়িব। পরীক্ষা না দিয়াও যদি ঐ রূপ করিয়া পড়া যায় তাহাহইলে সে ত সুখের বিষয়। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন পরীক্ষাই কি ভাল করিয়া পড়াশুনা করার একটী প্রধান উপায় নহে? এখন বোধ হয় লেখক বুঝিয়াছেন যে পরীক্ষারই জন্য মেয়েরা তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া আরও নানা রূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরীক্ষা দিতে অগ্রসর নহেন। পুরুষদের বরাবর জ্ঞানলাভ গৌণ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে কেননা

---

* পরীক্ষা দিলে আরও এক ফল হয় এই যে পরীক্ষার ফলে বোঝা যায় যে আমি এই বারে আবার যাহা পড়িতে যাইব তাহার উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত। সেই বুঝিয়া আমাকে আর এখনি নূতন ষ্টাণ্ডার্ড ধরিতে হইবে।

তাঁহাদের অনেক সময় চাকরির জন্য লেখাপড়া শিখিতে হয়, মেয়েদের পক্ষে ত আর এ কারণ খাটে না।

"লাঠির উপর লাঠি" লেখক মহাশয়ের ন্যায় আমিও এই বলিয়া দুঃখ করিতেছি যে আমাদের দেশের সুকুমারী বালিকারা যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের আয়ুক্ষয় করিয়া এতদূর সাহসে ভর দিয়া শত শত পুরুষের সহিত য়ুনিবর্সিটিতে পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন এজন্য কোন কবি তাঁহাদের বিলাপ গান গান গাহেন না, উল্টিয়া বালিকারা মন দিয়া পড়েন শুনেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অনেক লেখকের ভর্ৎসনা সহিতে হয়। এইত য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষা লইয়া লেখক মহাশয়ের সহিত খানিক লড়াই করা গেল। এইখানে একটী কথা। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন "এমন সযত্নে মেয়েদের এমন সৎশিক্ষা দাও, যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে।" ইহা সত্য, আজ কাল যেরূপ শিক্ষার প্রণালী তাহাতে পরীক্ষা দেওয়া যে মন্দ নহে, তাহাই আমি বলিলাম; কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে মেয়েদের পক্ষে য়ুনিবর্সিটির ষ্টাণ্ডার্ড পুস্তক যে কতদূর উপযোগী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ইহাতে মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে কি না, তাহাদের হৃদয়ের সৌকুমার্য্য পরিস্ফুট হইতেছে কিনা, সে বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ। আমার মনে হয় কি কি বিষয় শিক্ষা করিলে মেয়েদের বাস্তবিক উপকারে আসিবে, তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইবে, ইহা স্থির করিয়া মেয়েদের শিক্ষা—ছেলেদের শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র করা উচিত। সেইরূপ করিয়া স্কুলেই হউক বাটিতেই হউক ঐ সকল বিষয় যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষায় যেমন এণ্ট্র্যান্সের পর এল্এ, এল্-এর পর বিএ, বিএ-র পর এমএ, ইহাতেও সেইরূপ ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষা হইবে। এণ্ট্র্যান্স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে দুইই সমান থাকা ভাল, কারণ এণ্ট্র্যান্স জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পথ। এখন হইতে মেয়েরা এলএ-র পরিবর্ত্তে যাহা পড়িবে তাহার জন্য য়ুনিবর্সিটিতে একজামিন দিতে যাইবে না পূর্ব্বে যেরূপ ক্লাশ পরীক্ষা হইত, এখনও সেইরূপ হইবে, তবে প্রভেদ এই যে সব স্কুলেই এক প্রশ্ন হইবে। এখানে মেয়েদের উৎসাহের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তি থাকিবে। কিন্তু মেয়েদের জন্য ডিগ্রি থাকিবে না। বাস্তবিক মেয়েদের নামের পিছনে বিএ, এমএ ডিগ্রি ও পৌরুষিক পদবী গুলো যে কিরূপ কিম্ভূত কিমাকার দেখায় তাহা বলা যায় না।

আমিও আবার এক কথা হইতে আর এক কথায় আসিয়া পড়িলাম, সম্পাদিকা মহাশয়া নিজগুণে এ দোষ মাপ করিবেন। যাহা হউক আমি এক্ষণে যেরূপ বলিলাম সেইরূপ হইলে বোধ করি "লাঠির উপর লাঠী"-লেখক মহাশয়ের "শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তক, রুগ্ন পাক যন্ত্র" মেয়ে আর দেখিতে হইবে না, আর তিনি "মেয়েদের মধ্যেও আবার চোখে চসমা পকেটে কুইনাইন ও উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই-

বেন না। কারণ প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে অতগুলি ছেলের সহিত যোঝাযুঝি করিতে গিয়াই তাঁহাদের এই দশা ঘটে, তবে তাঁহাদের যুদ্ধই যদি থামিয়া গেল তাঁহাদের মধ্যে শান্তিই যদি স্থাপিত হইল, তাহা হইলে আর তাঁহাদের এ দুর্দ্দশার সম্ভাবনা কোথায়!

আপনার অনুগতা
য়ুনিবর্সিটির পরীক্ষার্থিণী—
জনৈক বালিকা।

প্রবাদ-প্রশ্ন। *

এবারে পাঠকদিগের জন্য আর একটি প্রবাদ-প্রশ্ন দেওয়া হইল। আপনারা বলুন দেখি প্রবাদটি কি?

প্রশ্ন কর্ত্তা গোপাল—হরি বাবু, মন্মথ সে দিন আপীসে যাইনি, সাহেব কিছু বল্লে?

হরি—মন্মথ নাকিসুরে আধো বাঙ্গলা আধো ইংরিজীতে যত কথা বল্‌লে, সাহেব শুনে হেসে গড়াগড়ি।

গোপাল—যাদু, তোমরা ত জনকতকে মিলে সে দিন শীকার কোরতে গেলে, মারলে কি?

যাদু—রামবাবু হাতে বন্দুক নিয়ে যোদ্ধার মত বুক ফুলিয়ে যেমন রেলগাড়ি থেকে নাবেবেন অমনি ধুতিতে পা জড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর এক আছাড় খেলেন! লোকে হাসি আর রাখতে পারলে না।

গোপাল—সত্যি নাকি রাম বাবু, ছিঃ! ছিঃ!!

রাম—যতটা শুন্‌চেন তত নয়।

গোপাল—মাধব, তুমি কি উপস্থিত ছিলে?

মাধব—ছিলাম বৈ কি।—উনি এমন পড়েছিলেন যে দশ জলে মিলে তবে ওঁকে তোলে। সকলে হাস্‌লে বটে, কিন্তু ওঁর ধুলো-মাখা মুখখানি দেখে আমার কান্না পেয়েছিলো।

---

* গত বারের প্রবাদ-প্রশ্নের উত্তর "দশের লাঠি একের বোঝা" সর্ব্ব প্রথমে আমাদের সীমলা পাহাড়ের একটি পাঠিকা শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী, ময়মনসিংহ হইতে বাবু নিশিকান্ত ঘোষ, এবং কলিকাতা হইতে বাবু গুরুদাস আঢ্য ও বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ পাঠাইয়া দিয়াছেন।
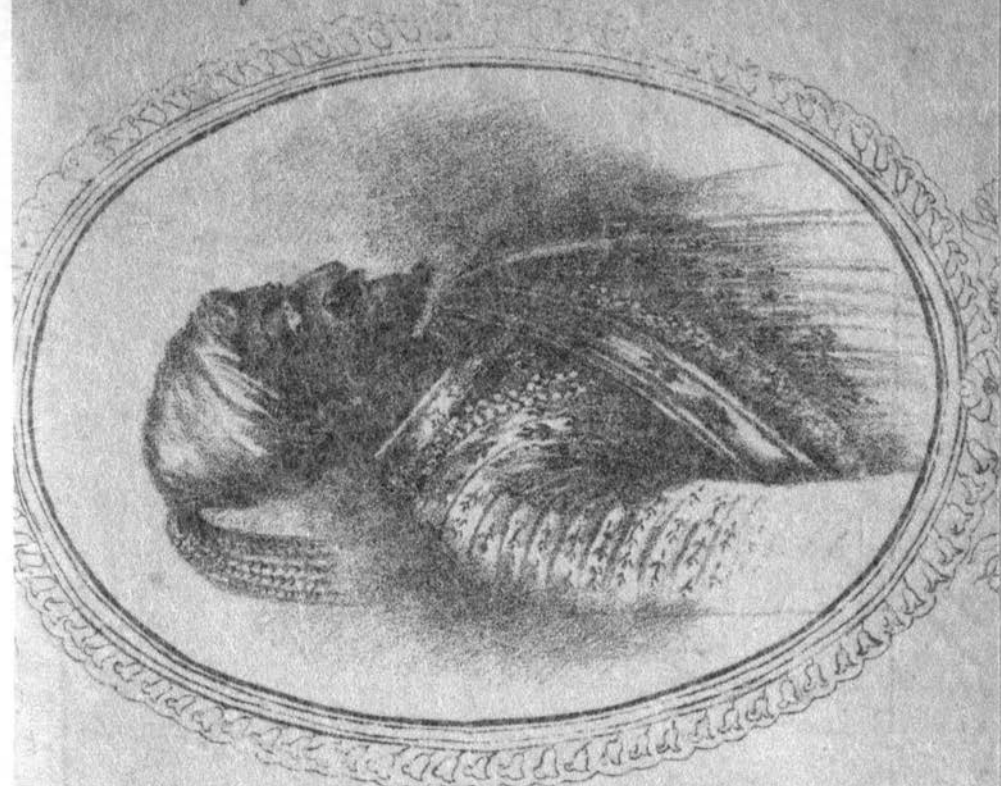
বোম্বাই সহর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন ইংরাজেরা বোম্বাই অধিকার করিয়া প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে তখন নিরাপদে রাজ্যভোগের সময় নহে—চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা, পদে পদে বিঘ্নবাধা;

ইংরাজ ভাগ্যলক্ষ্মী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম জলে স্থলে চারিদিকেই শত্রু। বোম্বায়ের শৈশবকাল কত ঝড় তুফান কত প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে—সে সময়ে এই দ্বীপ অন্য এক প্রবল জাতির গ্রাসে কেন যে পতিত হয় নাই সে কেবল ইংরাজ ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে। ইংরাজদের এমনি ভাগ্যবল যে এই বিপদ রাশি অতিক্রম করিয়া—এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই সহর ক্রমে পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ইংরাজ-রাজ-মুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে শোভা পাইতে লাগিল—সকল শত্রু একে একে পরাস্ত হইল—সমুদ্র জলদস্যু হইতে মুক্ত হইয়া বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক হইল—পরস্পরবিরোধী যোদ্ধ্‌দলের মৃত দেহের উপর দিয়া ইংরাজ আধিপত্য ভারত ভূমিতে বদ্ধমূল হইল। উত্তর হিমসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী কোথাকার মানুষ এদেশে সামান্য বণিক বেশে প্রবেশ করিয়া শতাব্দীর মধ্যে ভারতের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল।

তিন শত্রু তখনকার কালে এ অঞ্চলে ইংরাজদের প্রধান তিন শত্রু পোর্ত্তুগীস, মোগল ও মহারাষ্ট্রী।

পোর্ত্তুগীস পোর্ত্তুগীসদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশীয়ের মধ্যে তাহারাই ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দী—ইংরাজ-ফরাসীদের বিবাদ ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। পোর্ত্তুগীসেরা প্রথমে ত ইংরাজদের রীতিমত বোম্বাই দখল দিতেই চায় না। সন্ধি স্থাপন হইবার অনতিকাল পরে যখন ইংরাজ রাজ-পুরুষ পঞ্চ রণতরী ও পাঁচ শত সেনা সমভিব্যাহারে বোম্বাই দ্বীপ অধিকার করিতে আসেন তখন পোর্ত্তুগীস গবর্ণর দ্বীপটুকু ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, তাহার আনুষঙ্গিক সালসেট প্রভৃতি আর কয়েকটি দ্বীপ সঁপিবার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। এই বিবাদে পোর্ত্তুগীসদের প্রতিজ্ঞাই বজায় রহিল। ইংরাজ সৈন্য এ দেশে সেই প্রথম পদার্পণ করে, পোর্ত্তুগীসদের বিপক্ষে তাহাদের কোন বল খাটিল না। আর কোথাও দাঁড়া-

ইবার স্থান না পাইয়া বহু কষ্টে কারওয়ারের সমীপস্থ আঞ্জে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সমেত অনেকেই কালকবলে পতিত হইল। বোম্বাই দ্বীপ মাত্র দখল পাইয়া ইংরাজগণ তখন সন্তুষ্ট। এইরূপে প্রথম হইতেই ভারত ক্ষেত্রে এই দুই ইউরোপীয় জাতির মধ্যে রেষারেষি—কে কাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে স্থিরতা নাই। ঠানা—বান্দরা, সালসেট, কারাঞ্জা প্রভৃতি বোম্বায়ের নিকটস্থ প্রদেশ সকল তখন পোর্ত্তুগীসদের অধীন সুতরাং তাহারা নানা প্রকারে বোম্বাইবাসীদিগের উৎপীড়নে সক্ষম ছিল।

জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাব } এইরূপ কলহে কিছু কাল গত হইলে জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাব পোর্ত্তুগীস শত্রু বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। নবাব মোগল সম্রাটের পোতাধ্যক্ষ। সেকালে স্থলে যেমন ইংরাজ বণিকের প্রতাপ—জলেও তেমনি ইংরাজ জলদস্যুর উপদ্রব। সেই সকল দস্যুদের শাসন করিবার উদ্দেশে ১৬৮৮ অব্দে কাফ্রী নবাব ঔরঙ্গজীব বাদসাহের আদেশ ক্রমে বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা তখন অতি দুর্ব্বল, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠেন না, কৌশল ক্রমে সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। বোম্বায়ের উপর দিয়া সেই এক ভয়ানক ধাক্কা গিয়াছিল। নবাবের আক্রমণ নিষ্ফল দেখিয়া পোর্ত্তুগীসরা ইংরাজদের উপর আরো জলিয়া উঠিল; সাধ্যমত বৈরনির্যাতনে বিরত হইল না কিন্তু তাহাদের জোরজার মন্ত্র তন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল। পোর্ত্তুগীস রাজ্য এদেশে আর অধিক কাল টিকিতে পারে নাই। দিন দিন বর্দ্ধনশীল মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিকট ফিরিঙ্গিদিগকে শীঘ্রই নতশির হইতে হইল। তাহাদের অধীনস্থ স্থান সকল একে একে মহারাষ্ট্রীদের হস্তগত হইল। পাণিপত যুদ্ধের কথা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, সে যুদ্ধে আহমদ সা আবদালীর হস্তে মহারাষ্ট্রী সৈন্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন হইয়া মোগল রাজ্যের স্থানে হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আশা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; তার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে—মহারাষ্ট্রীদের মহোন্নতির কাল। তাহারা হিন্দুস্থানের আর আর সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—দক্ষিণে কর্ণাটক হইতে উত্তরে আগ্রা দিল্লী পর্য্যন্ত তাহারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—হোলকার, শিন্দে, গাইকওয়াড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আশা হইতেছে, হিন্দু-রাজা কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছগণ বহিষ্কৃত হইয়া স্বাধীনতা পতাকা ভারতে পুনরুড্ডীন হইবে। এই সময়ে পোর্ত্তুগীসদের উপর মহারাষ্ট্রীদের প্রধান আক্রোশ। পোর্ত্তুগীসদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের অধিকারবর্ত্তী সালসেট, বাসীন, ঠানা, কারাঞ্জা প্রভৃতি স্থান কড়িয়া লইয়া মহারাষ্ট্রীগণ শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত উৎপাটন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধভাগ গত হইতে না হইতেই ইংরাজেরা তাহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দীর উৎপাত হইতে বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইল।

ভারতবর্ষের অবস্থা

ইংরাজদের আগমন কালে ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি একবার মনোনিবেশ কর; করিলে সহজে বুঝিতে পারিবে ইংরাজ রাজ্য এদেশে কি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতীতের আলোচনা বিনা বর্ত্তমান যথাযথ বোধগম্য হয় না তাই কতকটা প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। যতদূর পারা যায় সংক্ষেপ সমালোচনই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাব ছাড়িয়া যদি একটুকু দূরে গিয়া পড়ি তাহা হইলে কিছু মনে করিও না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনও মোগল-যুগ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থলতান আল্লাউদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। দেড় শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদ নগর, গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয় নগরের হিন্দু রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহাদের বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র

চাঁদবিবি *

সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল রাজ্য ভুক্ত হয়। আহমদ নগর আক্রমণ সময়ে স্থলতানা চাঁদবিবি যে অসাধারণ বীরত্ব, অটল উদ্যম, ও জলন্ত দেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নাম ও-অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মোগলেরা আহমদনগর দুইবার আক্রমণ করে। প্রথম বারের আক্রমণ চাঁদবিবির অনিবার্য্য যত্নে নিবারিত হইল। তিনি তাঁহার আত্মীয় বিজাপুর স্থলতানকে সহায় পাইয়া ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল একত্রিত করিয়া সর্ব্বসংহারক মোগল দলের বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মুরাদ সৈন্যসামন্তে নগর দুর্গ বেষ্টন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত, বারুদে সমুদায় দুর্গ দুর্গবাসীসুদ্ধ উড়াইয়া দিবার উপক্রম, কিন্তু চাঁদবিবি কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন। প্রত্যহ অশেষ শঙ্কটের মধ্যে কেল্লা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বলাধানের উপায় দেখিতেছেন। মোগলবল-খনিত দুই সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় যোজনা করিলেন।

---

* প্রবন্ধের লেখক মহাশয় বহু কষ্টে পুরাকালের অতি প্রাচীন দুইখানি চাঁদবিবির জীর্ণ পট সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা চাঁদবিবির ছবি প্রকাশ করিলাম। সং—

তৃতীয় সুড়ঙ্গের বিরুদ্ধে কল চালাইবার পুর্ব্বেই শত্রুগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গরক্ষক বিনষ্ট হইল—প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা দিল। লোকেরা প্রাণ ভয়ে পলায়নোদ্যত। চাঁদবিবি কবচ ধারণ পূর্ব্বক মুখের উপর একটা ঘোমটা ফেলিয়া খোলা তলবার হস্তে সেই ক্ষতস্থানে গিয়া উৎসাহ বাক্যে সকলকে ডাকিয়া আনেন—তাঁহার দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল—গুলি গোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগলসৈন্য পিছু হটিয়া গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চাঁদবিবি সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকাংশে বুজিয়া গিয়াছে—তাহাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ, নূতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের উপায় নাই, যুবরাজ ভাবিলেন বড় ভাল গতিক নয়। প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন বরাড় (Berar) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে তিনি আর অধিক কিছু চান না। সুলতানা তাহাতে সম্মত হইলে যুবরাজ অল্পস্বল্প যথালাভে সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। চাঁদ সুলতানা সেবারকার মত নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য! তাহার দুইবৎসর পরে মোগলেরা ফিরিয়া আসিয়া আবার নগরের উপর হল্লা করিল। এবার আর চাঁদবিবির বল খাটিল না। বাহিরের শত্রু দমন করা সহজ যদি ঘরে শান্তি ও ঐক্য থাকে, কিন্তু ঘরের শত্রুর সঙ্গে পারিয়া ওঠে কাহার সাধ্য? এবার ঘরাও বিচ্ছেদ—চাঁদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনুচরবর্গ ফেলিয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করা—তা কি কখন হয়? প্রাণ বাঁচাইয়া কি হইবে যদি মানরক্ষা না হইল? অবশেষে সুলতানা অপার্য্যমানে মোগলদের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন এমন সময় নিজ সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেই গোলযোগেই তিনি প্রাণ হারাইলেন; এই পাপের ফল সদ্যই ফলিল। অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গভেদ করিয়া নগর অধিকার ও নাবালক রাজাকে বন্দী করিয়া মোগল সৈন্য জয়লাভ করিল।

দাক্ষিণাত্যে চাঁদবিবির অতুল কীর্ত্তি অদ্যাপি জনহৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার নগর সংরক্ষা-কাহিনী শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। যে সকল বীরাঙ্গনা সময়ে সময়ে উদিত হইয়া ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে স্বনাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, চাঁদবিবি তাঁহাদের মধ্যে গণনীয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির যে স্তুতিগান রচনা করেন তাহা এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুর-কাননে অপসরা
আছে নানা,
নর-ভবনে রূপবতী
কত আছে।

রণ-ক্ষেত্রে চাঁদবিবি।

বিজাপুরের রাণী চাঁদ
সুলতানা,
রূপে সবাই হার মানে
তাঁর কাছে॥
সদা সাহস ধ্রুব তাঁর
ঘোর রণে,
গৃহে শান্তি দয়া যেন
শোভমানা।
আহা, করুণা কত তাঁর
দীন জনে,
বিজাপুরের রাণী চাঁদ
সুলতানা॥
যথা, ফুলের মাঝে চাঁপা
সেরা মানি,
তরু-মাঝারে সহকার
সবে জিতে।
তথা, রাণীর মাঝে রাণী
চাঁদরাণী,
কেবা পারে গো তাঁর গুণ
বাখানিতে॥
যিনি জননী সম স্নেহে
স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন
সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম
স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম
স্মরণ-গাথা॥

বোম্বায়ে যখন ইংরাজ-অধিকার স্থাপন হয় বিজাপুর ও গলকণ্ড তখনও স্বাধীন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাজ্যদ্বয়কে দিল্লী-সাৎ করেন। ১৫ অক্টোবর ১৬১৫ অব্দে বীজাপুর, বর্ষেক পরে গলকণ্ডা মোগলরাজ্য ভুক্ত হয়। এইরূপ রাজ্য বিস্তারই মোগল রাজ্যের অধঃপাতের কারণ হইল। মুসলমানদের

যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়া মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধি পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য সকল অক্ষত থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ—ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মোগল সূর্য্য অস্তোন্মুখ, ওদিকে কোথা হইতে কাল মেঘ উঠিয়া অল্পকাল মধ্যে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভোঁসলে } ঐ কাল মেঘ শিবাজী ভোঁসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। একটু বেশী করিয়া বলিলে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি কিন্তু সুগঠন ও গৌরবর্ণ—লক্ষ্যভেদী জল-জল চক্ষু, কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের খনি—ধূর্ত্তশিরোমণি, তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল—জননীর চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া কোন মহৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুণায় তাঁহার জাহাগীর, তথায় দাদাজী কোণ্ডু নামক আচার্য্যের হস্তে শিবাজীর শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বালকের উপর দ্রোণাচার্য্যের শাসন কতদিন খাটে? মাওলী নামক চাসার দল তাঁহার সঙ্গী—লুটপাঠ ডাকাতি শীকার এই সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। খর্ব্বকায় অথচ দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানর-সৈন্যবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। পাহাড়ে দেশে তাঁর জন্ম—পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে যে সকল প্রকৃতির দুর্গ আছে তাহা একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় দুর্গে তাঁহার বাস—লুটের মাল হইতে তাঁহার ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। যখন যেমন সুবিধা—কখন বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে, কখন মোগল সম্রাটের অধীনে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজ কাজ সাধিয়া লইতেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন—যখন দেখিলেন "পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে" (ডোঙ্গরস্ লাবিলে দেবা)—সকলি প্রস্তুত তখন মুখোষ ফেলিয়া দিয়া নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আফজুল খাঁ } ক্রমে শিবাজীর দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল, বিজাপুর সুলতান আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। শিবাজীকে দমন না করিলে সে সর্ব্বদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খাঁ কোমর বাঁধিয়া শিবাজীকে ধরিতে বাহির হইলেন।

প্রতাপ গড় } সে সময়ে শিবাজী প্রতাপ গড়ের পাহাড়ে, মহাবলেশ্বর হইতে অনতিদূর। পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে অনেক সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবলেশ্বর সকলের সেরা। এই পর্ব্বতের শিখর পঞ্চনদীর আকর স্থান। তথায় মহাবলেশ্বর নামে দেব মন্দির বিরাজিত, তাহা হইতেই এই পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে। এই পাহাড় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহার ভূমি—গ্রীষ্ম ঋতুতে অনেকে নিম্নদেশ হইতে উত্তাপ নিবারণের জন্য মহাবলেশ্বরের ক্রোড়ে গিয়া বাস করে। সুন্দর রাস্তা, বিপণী, বাঙ্গলা, উদ্যান পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু শিবাজীর সময় এ সব কিছুই ছিল না। গাড়ী করিয়া পাহাড়ে চড়িবারও সুবিধা ছিল না—তখন তাহা দুর্গম তীর্থ স্থান। কিন্তু প্রকৃতির শোভা সেইরূপই আছে। পাহাড়ের প্রান্তবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন কোণ হইতে প্রকৃতির যে কঠোর সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনো যেমন এখনো তেমন। কতক গাছপালা-শূন্য কঠোর পর্ব্বত শ্রেণী;—কোন কোন পাহাড় দুস্তর বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়া গভীর পাতালে নামিয়া গিয়াছে। মহাবলেশ্বরের পশ্চিমে প্রতাপগড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া প্রকৃতির বলের উপর কৃত্রিম বল যোজিত হইয়াছে। শিবাজী এই দুর্গে ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। ম্লেচ্ছদের উপর হিন্দুদের জাতিবৈর দ্বিগুণ জলিয়া উঠিয়াছে। শিবাজী চর-মুখে সকল সংবাদ পাইতেছেন। আফজুল খাঁ অনেক সৈন্য সামন্তে পরিবৃত, তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে ও কৌশলে তাঁহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাব সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন ও ভয়ের ভান করিয়া এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন যে তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকারে এখনি প্রস্তুত, কেবল প্রাণভয়ে ধরা দিতে নারাজ। খাঁ সাহেব যদি প্রতাপগড়ে অধীনের সাক্ষাৎকারে সম্মত হন তাহা হইলে মুখে সকল কথা হইবে। অবশেষে তাহাই সাব্যস্ত হইল। নবাব কোন দুরভিসন্ধি মনে না আনিয়া শিবাজীর সহিত সহজভাবে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন—একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতলা মসলিনের কাপড়, আর একটী সোজা তলবার—সে শুধু অলঙ্কারের জন্য ব্যবহারের মানসে নয়। বেহারাগণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে পাল্কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। দূর হইতে দুজন মানুষ দেখা যাইতেছে—ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে তাহাদের পাদক্ষেপ। বাহিরে দেখিবে শিবাজী নিরস্ত্র কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহার 'ভবানী' তলবার ও 'বাঘনখ' গুপ্তাস্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্য শুভ্রবেশ কিন্তু ভিতরে লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন—খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে দস্তুরমত কোলা-

কুলি করিতে গেলেন। কিন্তু শিবাজীর সে ভাল্লুকের আলিঙ্গন—তাঁহার হস্তে প্রচ্ছন্ন 'বাঘনখ' ছিল তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ করিলেন। বাঘনখে যাহা হইবার বাকী ছিল 'ভবানী' খড়্গে তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন।

এ দিকে পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। কামানের ধ্বনিতে পাঁচবার দিগ্ দিগন্ত ধ্বনিত হইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তত ভাবে ছিল, শিবাজীর মাওলীরা চারিদিক্ হইতে তাহাদের উপর পড়িল। প্রত্যূষে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা মহাদর্পে আসিয়া পাহাড়ের নীচে কুচ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই দুর্দ্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল।

এই জয়লাভে শিবাজী উন্নতির সোপানে আর একধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। বিশ্বাসঘাতকতা যদিও এই জয়ের মূল কিন্তু শিবাজী তাহা পাইয়া নিদ্রিত রহিলেন না। তাঁহার সাধ যে পাহাড় দুর্গ হস্তগত করা—তাহা অবাধে মিটাইতে পারিলেন। এখনো কিন্তু সকল শঙ্কট দূর হয় নাই—বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফাঁড়া গিয়া আর এক ঘোরতর ফাঁড়া উপস্থিত। এই বিষম শঙ্কট হইতে কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহা বর্ণনা যোগ্য।

সায়েস্তা খাঁ { দক্ষিণের মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে শাসন করিতে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। শিবাজীর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নবাব পুণায় আসিয়া আড্ডা করিলে শিবাজী তাঁহার সিংহগড় কোটরে প্রবেশ করিলেন। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন তাহা এক সময়ে শিবাজীর বাসগৃহ ছিল, তিনি তাহার অন্তর বাহির সকলি তন্ন তন্ন করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনা পরিবৃত—বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে সকল উপায় যোজনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী এক রাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁহার দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া ২৫জন মাওলি সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে পশ্চাতের এক দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ এইরূপ আকস্মিক বিপদ দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়ন গৃহের গবাক্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচে পড়িয়া খড়্গাঘাতে দুইটি অঙ্গুলি মাত্র হারাইয়া কোন মতে পার পাইলেন। এই উপপ্লবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ নিহত হইল। শিবাজীর চকিতের ন্যায় উদয়—চকিতের ন্যায় অন্তর্ধ্যান। তাঁহার অনুচরগণের জয়ধ্বনি ও মসালের আলোকের মধ্যে মোগলদের চক্ষুর শূল হইয়া মহাসমারোহে স্বীয় দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত সাহসিক কার্য্যের আশাতীত ফল লাভ হইল। মোগল
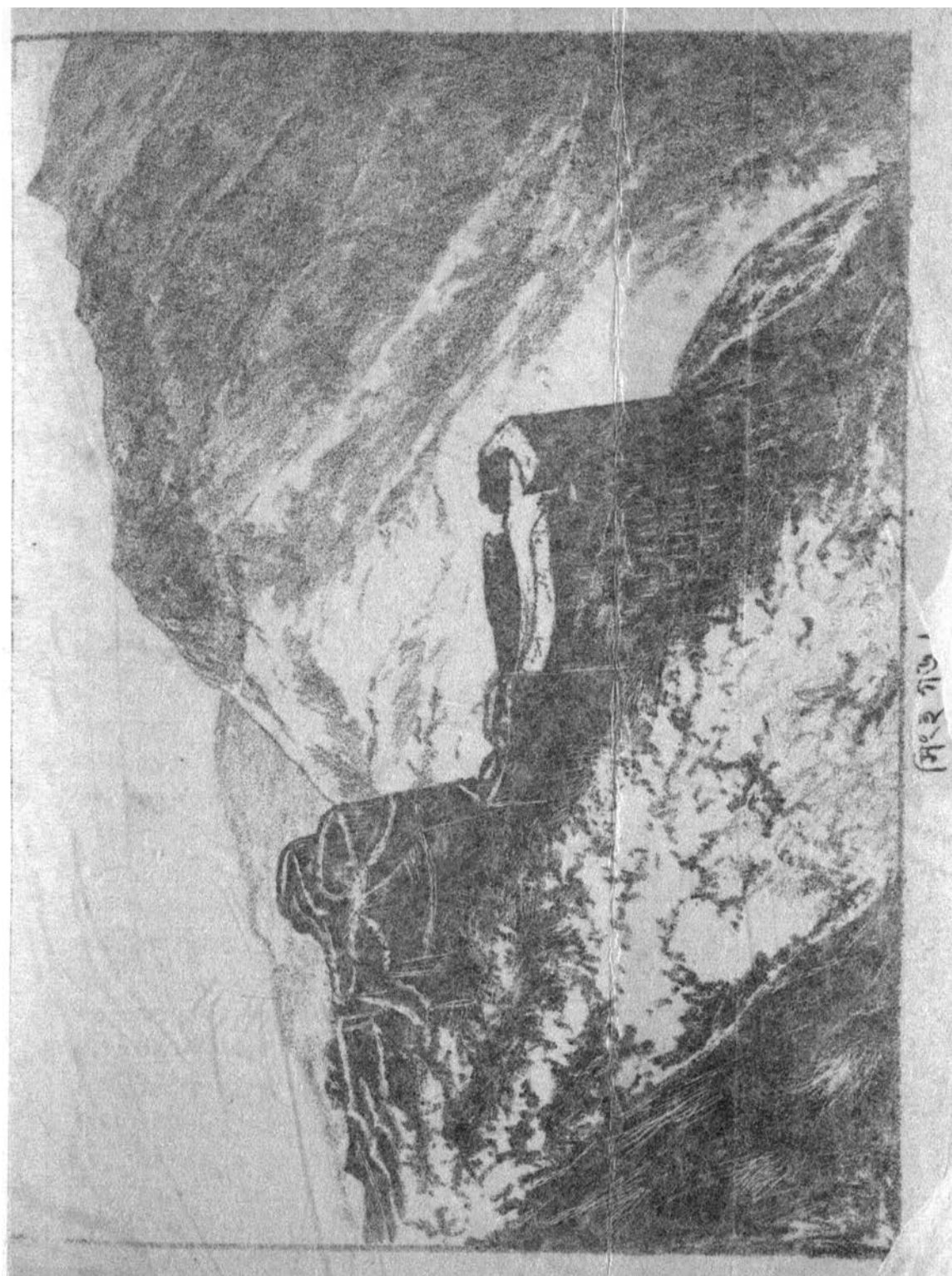
সিংহ গড়।

সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাত সন্দেহ করিয়া ছত্রভঙ্গী হইয়া পড়িল। শিবাজীর সাহস এমনি বাড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে হঠাৎ সুরাটে উপস্থিত হইয়া ছয় দিন ধরিয়া মনের সাধে নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধন রত্নে তাঁহার রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ করিলেন। এই আক্রমণ কালে ইংরাজেরা অতুল বিক্রম ও সাহসের সহিত আপনাদের সুরাটের কুঠি রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিশ সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে!

এই ঘটনার বৎসরেক পরেই দেখিতে পাই শিবাজী মোগল সম্রাটের কুহকে পড়িয়া আছেন। মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীরা এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে দিল্লী সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে স্বহস্তে দুই অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভোজীকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়া দেখিলেন—যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিছুই নয়,—যেরূপ মান-মর্য্যাদা পাইবার আশা ছিল তাহা পাইলেন না। রাজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর সরদারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদসাহ তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শিবাজীর মনে এমনি আঘাত লাগিল যে তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসায় গিয়া দেখেন তাঁহার গৃহের চারিদিকে সিপাই সান্ত্রীর পাহারা, পালাইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি

আশ্চর্য্য পলায়ন }

পীড়ার ছল করিয়া শয্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি আর একটা ফন্দী করিলেন। গরীব ফকীর-কাঙ্গালিদের মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করা তাঁহার এক কাজ হইল—ঐ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ী করিয়া পাঠান হইত। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক রাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ীর মধ্যে লুকাইয়া পুত্রবরকে আর একটায় পুরিয়া দুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন—দ্বারপালেরা অভ্যাসবশতঃ ওদিকে বড় লক্ষ্য করিল না। তাঁহার শয্যায় একজন ভৃত্যকে রাখিয়া দিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্য এক স্থানে অশ্ব প্রস্তুত ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া পুত্রকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া সেই যে একটানা চলিলেন আর কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরায় আসিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভস্ম লেপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। তথা হইতে আলাহাবাদ—আলাহাবাদ হইতে বারাণসী—বারাণসী হইতে গয়া তীর্থ—গয়া হইতে কটক,—কটক হইতে হাইদ্রাবাদ—এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

এই প্রকারে অশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শিবাজী অল্প অল্প তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইল। তিনি রাজা পদবী গ্রহণ করিয়া ৬ জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে মহা ধুমধাম করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। সেই উপলক্ষে আপনাকে স্বর্ণস্তূপে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভার স্বর্ণ রাশি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করত অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। শিবাজী রাজার রাজ্য লাভে যেমন চাতুর্য্য, রাজ্য সংগঠনেও তেমনি দক্ষতা, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলাম।

শিবাজীর প্রতিভাগুণে এই যে মহারাষ্ট্রী রাজ্য পত্তন হইল তাহা ক্রমে সমুদায় ভারতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বলিতে কি, শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মত বীর ও যশস্বী হয় নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী আমোদাসক্ত নিতান্ত

শম্ভোজী } অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছেন এমন সময় জনৈক মোগল সরদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকটে উপস্থিত করেন। শম্ভোজীর প্রাণরক্ষার্থে বাদসাহকে অনেকে অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন "তোর জীবন মরণ আমারই হাতে তা তুই জানিস্—যদি মুসলমান হতে রাজী হোস্ তা হলেই তোর প্রাণরক্ষা নতুবা জল্লাদের হাতে তোর মৃত্যু"। শম্ভোজী উত্তর দিলেন "বাদসা যদি আপনার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন তাহলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

পেশওয়া বংশ { শিবাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে ক্রমে রাজ্যভার মন্ত্রীপ্রধান পেশওয়া হস্তে সংন্যস্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ—শেষ পেশওয়া বাজীরাও। বাজীরাও-এর গ্রহ মন্দ, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্য হারাইলেন। ইংরাজদের আশ্রয়ে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। (১৮১৭) বাজীরাও পার্ব্বতী-মন্দির হইতে খড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন—সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশ পূর্ণ, সূর্য্যাস্তের মধ্যে সমস্ত সৈন্য ছারখার করিয়া ইংরাজেরা জয়ধ্বনির মধ্যে পুণা রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্য তাহাদের করতলন্যস্ত হইল।

কানোজী আঙ্গ্রে } আর একজন বীরের সঙ্গে ইংরাজদের মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘট্টন হইত—সে জলদস্যু আঙ্গ্রে। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাবের আধিপত্য ছিল—মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর হইতে মহারাষ্ট্রী সরদার আঙ্গ্রে তাহার স্থান

অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কানোজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত আঙ্গ্রে বংশের আধিপত্য কাল। রাঘোজীর মরণান্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া আঙ্গ্রে রাজ্য ইংরাজ-হস্তগত হয়। আঙ্গ্রে বংশের মূল পুরুষ কানোজী সামান্য লোক ছিলেন না। বোম্বায়ের কাছাকাছি যত জাহাজ আসিত তাহা তাঁহার লৌহহস্ত এড়াইতে পারিত না; পশ্চিম কূলের প্রধান প্রধান নগর—ত্রাবাঙ্কোর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত এই জলদস্যুর উপদ্রবে শশব্যস্ত। আঙ্গ্রের হাতে ইংরাজদেরও অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল—১৭২৪ ও ১৭৫৪র মধ্যে আঙ্গ্রে দুই ইংরাজ রণতরী গ্রেফতার করেন। কলিকাতা-বাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারিদিকে গর্ত্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণও আঙ্গ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ইংরাজ পোর্ত্তুগীস একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না। ১৭৫৫ অব্দে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে বশে আনিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন ও পর বৎসরে সুবর্ণ দুর্গ ও বিজয়দুর্গ তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। বিজয়দুর্গ পতনের পর ইংরাজ গবর্ণর তাহা লাভের জন্য উৎসুক হইয়া পেশওয়াকে অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও আর কতকগুলি গ্রাম উপার্জনে ক্ষতি পূরণ হইল। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজদিগকে মহারাষ্ট্রী রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি দিবেন না, বরং তথায় তাহাদের বাণিজ্য বন্দ করিয়া দিবেন। পোর্ত্তুগীসদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাদের পতন ও মহারাষ্ট্রীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধিস্থাপন বশতঃ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

এইরূপে ইংরাজেরা অল্পে অল্পে পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন। বোম্বাই তাহার রাজধানী হইল। বোম্বাই যে কি বহুমূল্য রত্ন ও তাহার ভাবি গৌরব তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন মোগল মহারাষ্ট্রী পোর্ত্তুগীস পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে রত থাকিয়া আপনাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিলেন তখন হইতে ইংরাজেরা ঐ রত্ন অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে তাঁহাদেরই জয় আর সকলের পরাজয়। ইংরাজদের এইরূপ প্রাধান্য লাভের কারণ কি? আলোচিত ঘটনা সূত্রই তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। দৈবের অনুকূলতা ছাড়িয়া দেও, তা ছাড়া বলিতে হইবে পরিপক্ক ইংরাজী রাজনীতিই তাহাদের রাজ্যলাভের মূল। সে নীতির সার মর্ম্ম এই, শত্রুদল বিচ্ছিন্ন করিয়া একের সাহায্যে অপরকে জয় কর, অনন্তর অবসর বুঝিয়া বন্ধুটিকেও পদতলে আনিয়া দলিত কর।

Lord Elphinstone } ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার নাই। ১৮১৯ অব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসেন। তাঁহার সময় হইতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়। রাস্তা ও গৃহ নির্ম্মাণ—শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন—বিদ্যাশিক্ষার নব প্রণালী উদ্ভাবন—আইন সংস্করণ ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হেতু তাঁহার শাসন বোম্বাইবাসীদের বিশেষ আদরণীয়। তিনিই নব্য বোম্বায়ের সূত্রপাত করিয়া যান—Sir Bartle Frere-এর আধিপত্যকালে বোম্বাই সহর উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

অথ রেখা-গণের আদি
(অর্থাৎ আরম্ভ-স্থান)
নিরূপণ।

উপর হইতে যবে দাঁড়ি হয় টানা,
উপরে দাঁড়ির আদি, আছেই তো জানা॥

উপর
আদি
|
নীচে

নীচে হৈতে ওঠে যবে লেখার গতিকে,
তখন তাহার আদি বিপরীত দিকে॥

আদি
আদি
কনক

আর সব রেখার, যে-দিকে যার বাম,
সেই দিকে আরম্ভ, ডাহিনে পরিণাম॥

বাম —ডাহিন বাম ◡ ডাহিন
আদি

ডাহিন ডাহিন
বাম বাম

বাম বাম
ডাহিন ডাহিন

অথ রেখা-লেখা পদ্ধতি।

সেই তো পুঁটুলিধর, যে ধরে পুঁটুলি।
লাঙ্গুল যাহার বাঁকা সেই তো লাঙ্গুলী॥
লাঙ্গুল যা, বঁড়শী তা, নামে শুধু ভেদ।
পুঁটুলিকে গ্রন্থি বল'—তাহে নাই খেদ॥

আদিতেই গ্রন্থিধর পুঁটুলি পাকায়।
অন্তেই লাঙ্গুলী সবে বঁড়শী বাঁকায়॥

নীচে হ'তে উচ্চে আর উচ্চ হ'তে নীচে।
লাঙ্গুলীর ল্যাজ বাঁকে, বিনা খিরকিচে॥

রণ রণ

লিখিতে হইলে-পরে গো-মহিষ-শিঙা,
নামো-দেশে এঁকো ভুরু উচ্চ দেশে ডিঙা॥

ডিঙা
ভুরু
ন ব ম

একটানে লেখো যবে রেখা একাধিক।
ওঠানাবা, নাবা ওঠা, এই জেনো ঠিক্॥

কসি-অন্তে কসি, কিম্বা, দাঁড়ি-অন্তে দাঁড়ি,
যে টানিবে তারে আমি বলিব আনাড়ি॥

গ
গ ন এরূপ লিখিবে না
গ এইরূপ লিখিবে
গ ন

ক এরূপ লিখিবে না
চ ক চ
ক এইরূপ লিখিবে
চ ক চ

লাঙ্গুল-হীনের অন্তে, পুঁটুলি-ধরের,
পিছমোড়া করি দিবে পুঁটুলীর ফের॥

ক ট ত প র স
ক ট ত প র স

চক্রাকারে, ল্যাজ যদি, গুটায় লাঙ্গুলী।
পুঁটুলি ধরের তাহা হইবে পুঁটুলি॥

খ ট থ প ল স
খ ট থ প ল স

অথ স্থূল-রেখার সূক্ষ্মীকরণ।

"পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ণ" চিবানো দুষ্কর,
সংক্ষেপে বলিব তাই "পূর্ব্ব আর পর॥"
বঁড়শী-বিহীনে হুল, বঁড়শীতে টোপ,
গ্রন্থিহীন পরের স্থূলত্ব করে লোপ॥

গজগ গজগ (জ'য়ে হুল বাড়াইয়া শেষ-গ সরু করা হইল)
পদ পদ (প'য়ে হুল, তাই দ সরু)

ভয় ভয় (ভ'য়ে টোপ গাঁথিয়া য সরু করা হইল)

বনগজ বনগজ (ন'য়ে হুল, তাই গ সরু)

তাম্বুরার লাউ করি বাঁধিলে পুঁটলি
গ্রন্থি-ধর রেখার স্থূলত্ব যায় চলি॥

তব তব
ব মোটা ব সরু
খবর খবর
ব মোটা ব সরু
গজ গজ
জ মোটা জ সরু
ঘজ ঘজ
জ মোটা জ সরু

স্থূলাঙ্গ হইলে পরে উর্দ্ধগামী রেখা,
সহজে না যায় তারে মোটা করি লেখা,
উচিত তাহারে, তাই, সরু করি টানা,
অধোগামী মোটা হো'ক্ তাহে নাহি মানা॥

উর্দ্ধগামী দ
এরূপ লিখিবে না
বদন
এইরূপ লিখিবে
বদন

উর্দ্ধগামী ব এবং য
ভবভয় এরূপ লিখিবে না
এইরূপ লিখিবে
ভবভয়

ইতি রেখা-লেখা পদ্ধতি।

বৈদ্যনাথ।

এবার আমাদের কালেজ বন্ধ হওয়ায় অনেক সাধ্যসাধনায় একবার বৈদ্যনাথ দেখিবার স্থবিধা পাইয়াছিলাম। ছুটির সময়টাকে তাস দাবা খেলিয়া হত্যা না করিয়া এরকম ছু একটা পাহাড় জঙ্গলের শোভা দেখিলে মনে যে কত আমোদ হয় তা অনেকে বোঝেন, কিন্তু মা-লক্ষ্মীর তাদৃশ কৃপা না থাকাতে আমাদের সকল সময় বিদেশ বেড়াইবার স্থবিধা ঘটিয়া উঠে না। যাই হোক, কলিকাতার নিকটে এরকম দেখিবার জায়গা খুব কমই আছে। আমরা গাড়িতে ৪।৫ জন ছিলাম, কিন্তু এক জন সেই দিন এল-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন কাজেই আমাদের বিধিমত আমোদ আহ্লাদ হয় নি। আমরা আগেই মনে করিয়াছিলাম নওয়াডিতে নামিব। নওয়াডির ষ্টেষণের কাছের পাহাড়গুলি কর্ডলাইনে যেতে বোধ হয় সকলেই দেখেছেন—তার কথা কিছু বেশি বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা প্রায় দুপ্রহরের সময় বৈদ্যনাথে পৌছিলাম। সকলেই জানেন বৈদ্যনাথ একটা বড় তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের মঠ ষ্টেষন হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দুরে। কিন্তু সম্প্রতি মঠ পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে হওয়াতে যাত্রীদের অনেক স্থবিধা হইয়াছে। বৈদ্যনাথ খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। অনেক বড় বড় লোক এখানে হাওয়া বদলাইতে আসেন। অনেকে এখানে বাংলা বানাইয়া রাখিয়াছেন। কেউ কেউ বাস করিয়া আছেন। এখানে বাঙ্গালি বড় কম নয়। এ জায়গাটাকে বাঙ্গলা ও বেহারের সীমানাস্থিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সব কথা বা বৈদ্যনাথ মঠ সম্বন্ধীয় কোন কথা আমার বলিবার আবশ্যক নাই। মহাত্মা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র Asiatic journal Vol LII Part I-এ সে সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। এখানে প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও অশেষ প্রকার লীলা খেলা দেখিয়া আমার মনে যা হইয়াছে তাই বলি।

বৈদ্যনাথ অথবা দেওঘর সহরটী খুব ছোট—কিন্তু ইহার চারিদিকেই বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, বড় বড় মাঠ, এই সব। এ সকল জায়গায় বেড়িয়ে খুব আমোদ হয়। কোনও দিকে বা একটা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত উঁচুনিচু ভাঙ্গাচোরা মাঠ পড়ে আছে—তার মধ্যে মধ্যে কোন খানে ছোট ছোট কালো পাথরের ঢিবি হাতির মত পড়ে আছে, হয়ত কতগুলি জঙ্গুলে গাছ তার উপর এমন ছায়া করে দিয়েছে যে দুই প্রহরের রৌদ্রে সেই পাথরের উপর ছায়ায় বসিয়া সেই দূর দিগন্তে ঝাপসা ঝাপসা গাছ বা একটা পাহাড় সীমানা রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে দেখিতে বোধ হয় যেন আকাশের গায়, গাছের পাতায়, প্রত্যেক জিনিষেই ঔদাস্যের আবছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। কোনও দিকে বা একটা বন—লম্বা লম্বা শাল-গাছ সার দিয়ে দাঁড়াইয়া যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও লতা, কাঁটা প্রভৃতি
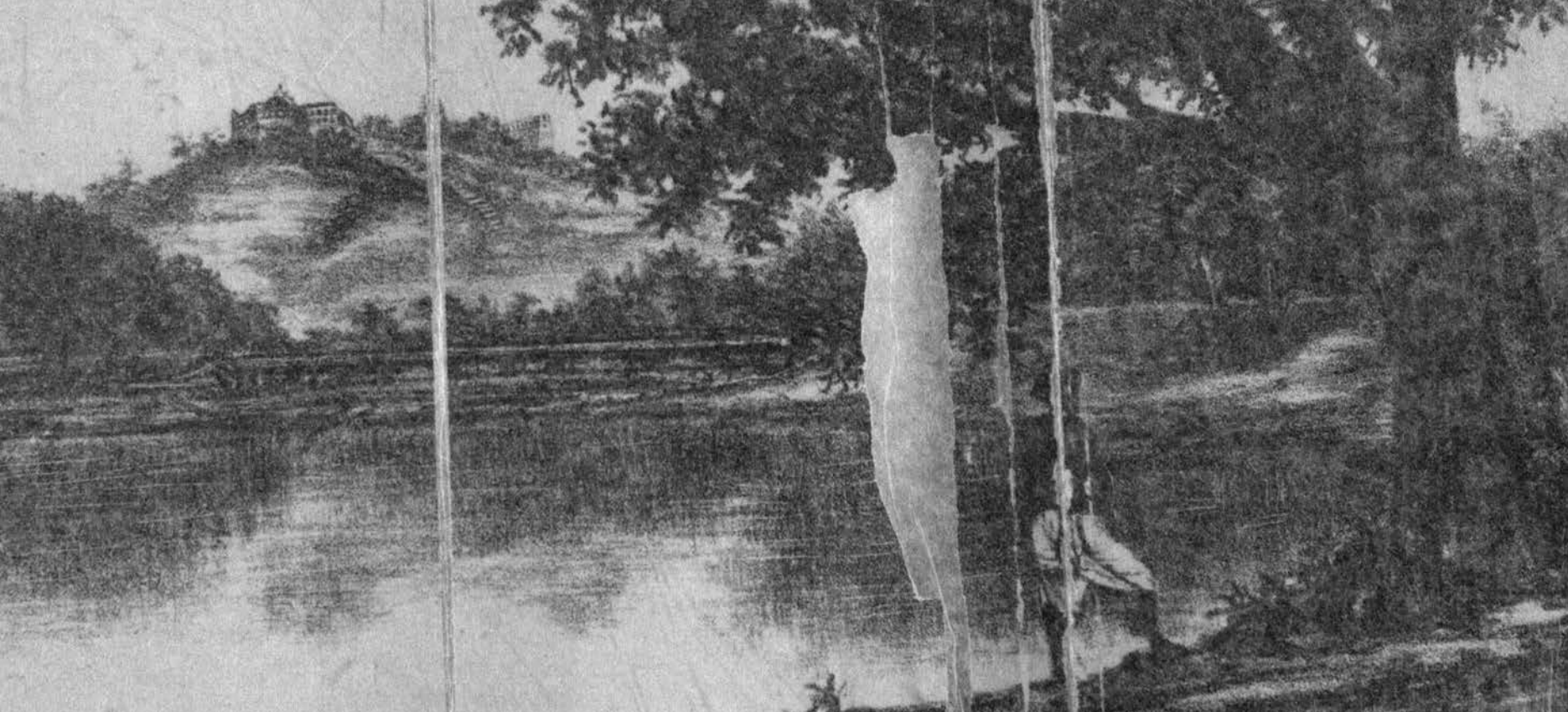
পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মাঝে হয়ত একটা ছোট শুষ্ক নদী রৌদ্রে তপ্ত হইয়া চিক্‌চিক করিতেছে, কোথাও বা বড় বড় গাছের তলায় তলায় ছায় ছায় কাহার জন্য যেন বিশ্রামের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা গাছতলা হ'তে একটি ক্ষুদ্র লতা ধীরে ধীরে খানিক দূর পর্য্যন্ত নদীর বুকে শুকান বালিতে আসিয়া আর চলিতে পারে নাই, সুকুমার দেহখানি ম্রিয়মাণ হ'য়ে গেছে। চারিদিকে কত শুকান পাতা বালিতে পড়িয়া আরও শুকাইয়া গিয়াছে। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখিলেই বোধ হয় যেন স্থানটী শান্তিময়ী বনদেবীর তপোমন্দির! কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই—কেবল বায়ুর হুহু হুহু শব্দ আর বনের পাখির থেকে থেকে গান—একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এ সময়ে যে কি রকম মনে হয় তা এখানে না এলে আর বোঝা যায় না। আর, এ বনে বেড়াইতেও কোন ভয় নাই। বাঘ এখানে প্রায়ই দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে কাটুরিয়ারা কাঠ কাটিতে আসে। আমরা একদিন এই বনে বেড়াইতে গিয়া দূরে সাদাপানা কি একটা দেখিতে পাইলাম। কাছে গিয়ে দেখি কালো পাথরে চুনকাম করে সিন্দুর দিয়ে কে একটী লাঙ্গুলে "মহাবীরের" (হনুমানের) চেহারা আঁকিয়া রেখেছে। মহাত্মার লোভনীয় কোন পদার্থ চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্ট হইল না। এই রকম বনে বেড়াইলে ছোট খাট কত বিষয়ে কত আমোদ পাওয়া যায় তা এক এক বার মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।

উপরে যে নদীর কথা বলিয়াছি তা আর একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। নদী গুলি যে বেশি চওড়া তা নয়, জোর ১০।১২ হাত। বর্ষাকাল ভিন্ন আর কখনও প্রায় জল থাকে না। গয়ার ফল্গু নদীর ন্যায় খানিক খুঁড়িলে তবে জল পাওয়া যায়। নদীর জল খুব ভাল, বড় হজমী। এখানে দুদিন আসিয়া আমাদের খোরাক বাড়িয়া গিয়াছে। যত খাওয়া যায় উদরের শূন্যতা আর পূরে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদ্যনাথ জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, তা বোধ হয় জলের গুণে। মধ্যে মধ্যে যখন মেলা হয় তখন যাত্রী অনেক হওয়ায় ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের আবির্ভাব হয় বটে কিন্তু সচরাচর তা বড় দেখা যায় না। আমি নদীর কথা বলিতে ছিলাম—এক দিন বৃষ্টির পর আমরা নদীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এটাও একটা জঙ্গলের ভিতরে, নাম "ইন্দ্রাসন"—প্রকৃতই ইন্দ্রাসন! কিন্তু এখন আর নদীর সে ভাব নাই। ঝির ঝির করে খানিকটা জল—আকাশে যেমন এক এক দিন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সূক্ষ্ম মেঘ উঠে তেমনি হয়ে—বালির উপরে বয়ে যাচ্চে। আমি নদীর উপর হেঁটে যাইতেছিলাম। একটু বৃষ্টি হলেই নদীতে বান আসে, আবার তখনই চলে যায়। ভিজে বালি খাঁজকাটা খাঁজকাটা হ'য়ে আছে—তার উপর পা দিলেই জল উঠে। শুকান তপ্ত নদীর এমন কি সরস করুণামাখা ভাব!—পা দিয়া বুক দলিয়া যাইতেছ—নদীর জল উছলিয়া পা ধুয়াইয়া দিতেছে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। এক এক জায়গায় নদী খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে—সেইখানে দুই ধারের পাড় খুব উঁচু

হয়ে গেছে—বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। বনের মধ্যে এ সময়ে সহসা মনে কি রকম এক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার, উপরে সন্ধ্যার সময় পাখির আওয়াজ আর হাওয়ার মৃদু মৃদু হু হু শব্দ শুনে প্রাণটা উধাও হয়ে উপরে উড়িতে চায় কিন্তু নদীর ভিজে বালিতে আঁটু পর্যন্ত গাড়িয়া নদীর একতান কুলুকুলু ধ্বনী শুনিয়া দেহ প্রাণ দুইই বাঁধা পড়ে থাকে—উঠিতে পারে না।

এখানে যে অনেক পাহাড় আছে তা আগেই বলেছি। সহরের মাইলখানেক পশ্চিমে "নন্দন পাহাড়" বলে একটা বড় পাথরের ঢিপি আছে, তাকে আর পাহাড় বলে না! সুধু একটা চাঁচা ছোলা গোলকার্দ্ধের মত পাথরের ঢিবি। একটা কেবল একল-সেঁড়ে সাদা চামড়া আধ শুকান গাছ আছে সেটার আবার বয়স ও জাত নাকি কেউ ঠিক কর্ত্তে পারে না! আমার বোধ হয় একটা ভেরেণ্ডা গাছ একটু বড় হ'য়ে "ক্রমায়তে" হ'য়ে পড়েছে। এর উপরে একটা ছাদহীন (বোধ হয় সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালের) ঘর আছে। তার ইঁট-গুলা বট-অশথের শিকড় জড়িয়ে কোন ক্রমে আট্‌কে আছে আর কি! এক রকম মখমলের মতন ঘাস আছে তার উপর পা রাখিতে বেশ আরাম! এর ত আর আমি কোন শোভাই দেখি নে, শোভা থাকাও অসম্ভব। কিন্তু সহর থেকে ছক্রোশ দূরে "তপোবন" বলে যে একটা পাহাড় আছে সেটা দেখবার উপ-যুক্ত বটে। যিনি বৈদ্যনাথ দেখিতে আসেন, তাঁর সেটা দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেখানে যাবার আসিবার বড় সুবিধা নাই। এক গরুর গাড়ি আছে—কিন্তু তার নাম করা-তেই বোধ হয় অনেকের শারীরিক বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা। তার পর, যে রাস্তা তাতে যে পাল্কি আছে, তাতে চড়িয়া গেলে হাড়গোড় সমেত আস্ত ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা খুব কম। উঁচু নিচু রাস্তা তাতে সেই বাহকদের হাঁকানির তালে তালে পাল্কি সমেত স্বর্গ হইতে রসাতলচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ-প্রাণের ক্ষীণ আশার ভীষণ উত্থান পতনে বুকের ভিতর যে কি হয় তা বলা যায় না! ক্ষুদ্র প্রাণটা এতটুকু হইয়া বুকের কোন কোণে যে সাঁধাইয়া যায়—তা নির্ণয় করা দুরূহ। সে বিপ্লবের স্মৃতি বহু-কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভীতিজনক কার্য্য করে। কিন্তু একবার পাহাড়ের কাছে আসিলে সব সার্থক হয়, "তপোবন" পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়। এর উপরে বেশ ঘন ঘন শাল আর অন্য অন্য অনেক গাছ আছে। অনেক স্বাভাবিক গুহা আছে। তার ভিতরে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানকার লোকে বলে যে এটা বাল্মীকির তপোবন, কিন্তু একথাটা যে তাহারা পয়সা রোজকার করিবার জন্য রটাইয়াছে তা আর বলিতে হইবে না। রামনবমীর সময় এখানে মেলা হয়, তখন অনেক লোক হয়। এই গুহার ভিতর প্রদীপ লইয়া গেলে নিভিয়া যায়, কিন্তু আমি দেখিয়াছি ১০।১৫ জন মানুষ এক সঙ্গে গিয়া মূর্ত্তি,স্পর্শ করিয়া আসিতেছে। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টি করিলে কি উন্মাদক ভাবে যে প্রাণ ভরিয়া যায় তা বর্ণনা করা আমার ক্ষমতার বহু দূরে।

আমাদের পেছনে খানিক দূরে আর একটা শৃঙ্গ আকাশে—যেন কে কত উঁচু পরীক্ষা করিতে—উঠিয়াছে; আর দুটা শৃঙ্গের মধ্যে উপত্যকা গভীর শ্যামবর্ণে ঢাকা—যেন প্রকৃতির দোলনা। কে যেন এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে বুটিদার একটানা সবুজ বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছে। জীবনের প্রতি মায়া আর একটু কম থাকিলে আমরা সেখান হইতে শীঘ্র নামিতাম না। নামিবার সময় আমরা একটা মড়ার মাথা দেখিতে পাইলাম! সেটা কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় আমাদেরই মত কোন হতভাগা পাহাড়ের শোভা দেখিতে আসিয়া নিজের সমাধি করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানে বাঘ, ভল্লুক, প্রায়ই দেখা যায় না, তবে মধ্যে মধ্যে এক এক বার পাশের বন জঙ্গল থেকে দেখা দেয়, আমরা নীচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক জায়গায় আবদ্ধ হইয়া গেলাম, খানিকটা জায়গা জুড়ে চারিদিকেই দেয়ালের মতন পাথর ঘিরে দাঁড়িয়েছে—হঠাৎ যেন হাত ঘিরে বল্‌চে—"আর যেতে দিব না!" পাথরের গায় বড় বড় গাছ, তাদের জট অজগর সাপের মত পাথর আঁকড়ে শুয়ে আছে। উপর থেকে বড় বড় মোটা মোটা লতা ঝুল্‌চে। উপর হইতে কতগুলা গাছ ভিতরকার গাছের সঙ্গে যেন কথা কহিবার জন্য মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে। একটুখানি নীল আকাশ উপরে গাছের পাতার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। এখানে আসিলে ক্ষুদ্র মানুষের অহ-ঙ্কার গর্ব্বভরা মন যে কোথায় চলে যায় তার ঠিকানা থাকে না। সেখানে একবার কথা কহিলে কে যেন শতমুখে ভেঙচাতে থাকে। নিজের পদশব্দে নিজে শঙ্কিত হইতে হয়। আমরা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যে পথে আসিয়া ছিলাম সেই পথে ফিরিয়া আসিলাম।

সাঁওতাল পরগণার এরূপ সকল জায়গাই পাহাড়ে জঙ্গলে। যাহাদের দূর দেশ বেড়ান ঘটিয়া উঠে না তাঁহাদের কলিকাতার সন্নিকটে এসব দেশ বেড়ান ও নিতান্ত উচিৎ।

দেওঘর সহর হইতে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরে ত্রিকূট পাহাড়। এই পাহাড়টা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু। আমাদের সুবিধা না হওয়ায় ও সময় না থাকায় সেটা দেখা হয় নাই।

শেষ করিবার সময় একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। এ দেশে গাছে এক প্রকার পিপীলিকা থাকে। সেই ক্ষুদ্র জানোয়ারের তীব্র দংশন যে কি ভয়ানক তা মনে পড়িলে এখনও গা সিউরে উঠে। কামানের গোলা সহ্য করিতে পারি তবু তার দংশনের জ্বালা সহ্য হয় না।

বীর-জননী।

অধিকাংশ বড় লোকের জীবন চরিত পাঠ করিলে দেখা যায়—তাঁহাদের মাতার চরিত্রে যে সকল মহত্বের লক্ষণ ও সদ্‌গুণ বিদ্যমান ছিল তাহাই পুত্রেরা মাতৃ দুগ্ধের সহিত আত্মসাৎ করিয়া মহত্ব শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ক্রমশঃ তাহার এক একটী দৃষ্টান্ত আমরা পাঠক বর্গের সমক্ষে অর্পণ করিব। কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির স্ত্রীলোকদিগকে উন্নত করা আবশ্যক। এই জন্য আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে দেশের স্ত্রীলোক অজ্ঞান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দাসত্ব ব্রতে রত, সে জাতির মধ্যে বড় লোকের আবির্ভাব দুর্লভ। স্ত্রীলোকেরা নিজে বড় লোক বলিয়া প্রখ্যাত না হইতে পারেন, কিন্তু পুরুষদিগকে বড় লোক করিয়া তোলা তাঁদের কাজ; তাঁহাদের সন্তানসন্ততির চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে তাঁদের জীবনের সার্থকতা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। ওয়াসিংটনের মাতার জীবন চরিত পাঠ করিলে এই কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।

ওয়াসিংটনের মাতার স্বামী-বিয়োগ হইলে পর, তাঁহার শিশু সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার সমস্ত তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। এই সঙ্কট কালে তিনি তাঁহার পুত্রকে যে রূপে লালনপালন করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে সকল মহত্বের বীজ তাঁহার কোমল মনে রোপণ করিয়াছিলেন তাহারই গুণে আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা—আমেরিকার উদ্ধার-কর্ত্তা মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে এত যশ কীর্ত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জর্জ ওয়াসিংটনের পিতৃ-বিয়োগের সময়, তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র ছিল। ওয়াসিংটন বলিতেন, তাঁহার পিতার চেহারা তাঁহার মনে পড়ে, তিনি যে তাঁহাকে আদর করিতেন তাহাও মনে পড়ে, তাঁহার বিষয় আর কিছু তিনি বলিতে পারেন না—কিন্তু তাঁহার যশকীর্ত্তি সৌভাগ্য সমস্ত মাতার স্নেহ যত্নেই যে তিনি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই।

ওয়াসিংটনের মাতা গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব গৃহের মধ্যে অক্ষুণ্ণ অটল ছিল; গৃহের মধ্যে পরিপাটি শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। মাতার নিকট শিশু সন্তান যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, যে রূপ আব্‌দার পাইয়া থাকে তাহা ওয়াসিংটন পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহার সহিত সংযম ও আত্ম-সম্বরণেরও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কোন বৈধ শৈশব-সুলভ আমোদ আহ্লাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত করিতে দিতেন না। এই রূপে আমেরিকার ভাবী কর্ত্তৃ পুরুষ মাতার নিকট আজ্ঞা পালনের শিক্ষা পাইয়া আজ্ঞা দিবার অধিকারের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ওয়া-

সিংটনের মাতা পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াও গুরুজন-সুলভ কর্তৃত্ব ছাড়েন নাই, এমন কি ওয়াসিংটন যখন প্রখ্যাত বড় লোক হইয়া উঠিলেন তখনও তাঁহারা মাতা নিজ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সেই কর্তৃত্ব যেন এইরূপ ভাবে বলিত, "আমি তোমার মাতা—আমি তোমাকে পদচালনা করিতে শিখাইয়াছি—আমার মাতৃস্নেহে তোমার ভাল বাসা আকর্ষণ করিয়াছে—আমার কর্তৃত্ব তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়াছে; এখন তোমার যতই যশকীর্ত্তি হউক না কেন, (ঈশ্বরের নীচেই) তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি আমার প্রতি প্রযুজ্য।"

ওয়াসিংটনও তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের একজন শৈশব সহচর ওয়াসিংটনের মাতৃ-গৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

"আমি ওয়াসিংটনের সমপাঠী ও খেলার সাথী ছিলাম। আমি ওয়াসিংটনের মাতাকে যেরূপ ভয় করিতাম, সেরূপ ভয় আমার নিজের পিতামাতাকেও করিতাম না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন—তাঁর অজস্র দয়ার মধ্যে থাকিয়াও কেমন তাঁহাকে দেখিলে একটা সমীহ হইত। এখন তো আমার চুল পাকিয়াছে—আমার নাতী-পুতী হইয়াছে—তবু যদি এখন আমি তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাই, আমার মনে কেমন এক রকম অবর্ণনীয় ভাব উপস্থিত হয়। আমেরিকার পিতৃস্থানীয় ওয়াসিংটনকে দেখিলে যেমন ভয়মিশ্র ভক্তি ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ তাঁহার গৃহকর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী মাতাকে দেখিয়া সেই প্রকার ভাবের উদয় হইত।"

এই প্রকার গার্হস্থ্য-শক্তির অধীনে থাকিয়া ওয়াসিংটনের মন গঠিত হইয়াছিল।

যখন ওয়াসিংটন আমেরিক সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার মাতাকে বিপদ আপদ হইতে দূরে ও আত্মীয় স্বজনের নিকটে রাখিবার জন্য একটি গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা সেই বিপ্লবের সময়ে সেই গ্রামে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দূতেরা কখন জয়ের সংবাদ আনিতেছে—কখন বা পরাজয়ের সংবাদ আনিতেছে—কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, জয় পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া অন্য বীর-মাতাদিগকে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রশমিত করিতেন।

কোন-এক যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, ওয়াসিংটনের মাতার নিকট তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া সেই সুসংবাদ দিলেন এবং ওয়াসিংটন সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসার কথা ছিল তাঁহারা যুদ্ধের পত্র হইতে পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই সুসংবাদে মাতা খুসি হইলেন কিন্তু বেশি প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু মহাশয়গণ, এ বড় বেশি রকম স্তুতিবাদ—তবু আমি জর্জকে ছেলে বেলায় যে শিক্ষা দিয়েছিলেম, বোধ হয় সে ভুলবে না—এত প্রশংসা শুনেও বোধ হয় সে আত্মবিস্মৃত হবে না।"

প্রথম হইতে ওয়াসিংটনের মাতা যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন—ইংরাজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস পরাজিত হইয়াছেন এবং আমেরিকেরা জয়ী হইয়াছে তখন তিনি করযোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরকে প্রণাম! এতদিনে যুদ্ধ শেষ হইল, এক্ষণ আমাদের দেশ সুখশান্তি স্বাধীনতার প্রসাদ উপভোগ করিবে।"

যখন ওয়াসিংটনের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল—তাঁহার গৃহে সৌভাগ্য রবি উদিত হইল; তখনও তাঁহার মাতার সাদাসিধা অভ্যাস ও তাঁহার সরল গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সেই তিনি পূর্ব্বেকার ন্যায় গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, ঘোড়ায় চড়িয়া আপনার ক্ষেত পরিদর্শন করিতেন, যদিও তাঁহার টাকা কড়ি বেশি ছিল না, তবু মিতব্যয়ী হইয়া পরিশ্রমের সহিত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম এমন গুছাইয়া করিতেন, যে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অনটন হইত না বরং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে অনেক গরিব কাঙ্গালকে দান করিতেন। ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম করিয়া একটি যৎসামান্য গৃহে নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া বরাবর সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার ছেলেরা ও তাঁহার নাতি পুতিরা আসিয়া বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত কোন ভাল গৃহে যাইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিত। কিন্তু তিনি তাঁহাদের এই উত্তর করিতেন 'তোমাদের ভালবাসা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এই পৃথিবীতে আমার অভাব অতি অল্প, আর, আমার নিজের রক্ষণ ভার আমি নিজেই নিতে পারি।" তাঁহার জামাতা একবার বলিয়াছিল যে সাংসারিক কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হউন—তাহাতে তিনি বলিলেন "আমার দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছে—আমার বইগুলি শুধু আমার হয়ে তুমি গুছিয়ে রেখো কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম্ম আমিই চালাবো।"

ওয়াসিংটনের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—জীবনের শেষাবস্থায় তিনি আর প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে যাইতেন না—প্রতিদিন তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী পাহাড় কিম্বা গাছপালা বিশিষ্ট কোন বিজন স্থানে—সংসার হইতে এবং সাংসারিক বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের পূজাঅর্চ্চনা ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

৭ বৎসর বিচ্ছেদের পর, মাতা পুত্রে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ শেষ হইলে, ওয়াসিংটন সৈন্যসামন্ত লইয়া YorkTown হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঘোটক-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, মাতার নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। এবং সৈন্যসামন্ত জাঁকজমক পশ্চাতে রাখিয়া তিনি একাকী পদব্রজে তাঁহার মাতৃ-গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন, জাঁকজমক আড়ম্বরে তাঁহার মাতা আহ্লাদিত হইবেন না।

গৃহকর্ত্রী একাকী সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন তাঁহার

পুত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি তাঁহার ছেলেবেলার নাম ধরিয়া তাঁহাকে সস্নেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—বলিলেন, যুদ্ধের ভাবনায় তাহার মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে—সে কালের কথা—পুরাতন বন্ধুদিগের বিষয় অনেক বলিলেন কিন্তু পুত্রের নবোপার্জ্জিত যশ গৌরবের বিষয়—একটি কথাও বলিলেন না।

ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে মহা ধূম ধাম পড়িয়া গেল—ফরাসি ও আমেরিক সৈন্যেরা, সেনানায়কগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভদ্র লোকেরা, বিজয়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামবাসীগণ নৃত্য আমোদ আহ্লাদের একটা প্রকাণ্ড আয়োজন করিল এবং বিশেষ করিয়া ওয়াসিংটনের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই মনে করিতেছিল য়ুরোপীয় প্রথা অনুসারে ওয়াসিংটনের মাতা নিমন্ত্রণ-স্থলে খুব সাজসজ্জা ও ধূম ধাম করিয়া আসিবেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, তাঁহার পুত্রের বাহুতে ভর দিয়া অতি সামান্য বেশে তাঁহার মাতা অভ্যর্থনা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহাকে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নানা প্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—এবং সেখানে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমোদ আহ্লাদ কর—সুখে থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ—আমাদের মত বুড় মানুষের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত" এই বলিয়া তিনি সকাল সকাল বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ফরাসিস্ সেনাপতি লাফাইএট্ য়ুরোপে প্রস্থান করিবার সময় ওয়াসিংটনের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসায় তিনি ফরাসিস্ সেনাপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহার মুখে পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"জর্জ যাহা করিয়াছে তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ, সে বরাবরই খুব ভাল ছেলে ছিল।"

জর্জ ওয়াসিংটন, প্রধান মেজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়া New York নগরে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"মা, আমাকে সকলে একবাক্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছে; আমি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছি। নূতন শাসন প্রণালীর বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইবামাত্রই আমি শীঘ্র বর্জিনিয়াতে আসিব, আর"—তাঁহার মাতা এই সময়ে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন: 'আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। আমার যে রকম বয়স হয়ছে, আর যে রোগ আমাকে ধরেছে, তাতে এ লোকে আর বেশী দিন আমার থাকৃতে হবে না। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় আমি উন্নততর লোকের জন্য কতকটা প্রস্তুত হয়েছি। কিন্তু তুমি যাও জর্জ, ঈশ্বর তোমার প্রতি যে মহান্ কাজের ভার দিয়াছেন তাহা সম্পন্ন কর; যাও—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করবে।"

ওয়াসিংটনের হৃদয় বিগলিত হইল। মাতার স্কন্ধে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত ছিল, বৃদ্ধ মাতা তাঁর দুর্ব্বল বাহুপাশে পুত্রের কণ্ঠদেশ স্নেহ ভরে জড়াইয়া ছিলেন, যাহার কঠোর কটাক্ষে তেজীয়ান বীর-বৃন্দ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিত, সেই নেত্র আজ স্নিগ্ধ ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া বৃদ্ধা মাতার মুখের পানে অবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বীর-পুরুষ শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল—যে মাতার স্নেহ যত্ন ও শিক্ষার গুণে তিনি যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, সেই মাতাকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে—আর তাঁকে দেখিতে পাইবেন না। এই মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—পুরাতন রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, ৮৫ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি মানব লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

পুরোনো বট।

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুর ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছ আঁকা,
শিরে আকাশ পট।
নেবে নেবে গেছে জলে,
শিকড় গুলো দলে দলে,
সাপের মত রসাতলে,
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা বাহু তুলি
বায়ুর সাথে কোলাকুলি,
আনন্দেতে দোলাছলি,
গভীর প্রেমভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষকোটি পাতা,

আপন মনে গাও গাথা
ঢুলাও মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের মেঘ ঝটিতি এসে,
দাঁড়িয়ে থাকে এলো কেশে,
তলে গভীর ছায়া।
ঝটিকা আসে তোমার কোলে
তোমার বাহু পরে দোলে,
গান গাহে সে উতরোলে,
ঘুমোলে তবে থামে।
পাতার ফাঁকে তারা ফুটে,
পাতার কোলে বাতাস লুটে,
ডাইনে তব প্রভাত উঠে,
সন্ধ্যা টুটে বামে।

নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট ?
কতই পাখী তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোট ছেলেরে তাদেরি মত
ভুলে কি যেতে আছে ?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধে ছিল যে নীড়।
(তোমার) ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক্ দুনয়নে ?

তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে
শালিখ পাখি দুটি।
ভাঙ্গা ঘাটে নাইত কারা
তুল্‌ত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
কর্‌ত টলমল।
জলের উপর রোদ প'ড়েছে
সোণামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোট ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
(যদি) বায়ুর মত খেল্‌তে পেত
তোমার চারি ভিতে,
(যদি) ছায়ার মত শুতে পেত
তোমার ছায়াটিতে,
(যদি) পাখীর মত উড়ে যেত
উড়ে আস্‌ত ফিরে,
(যদি) হাঁসের মত ভেসে যেত
নদীর তীরে তীরে।
নাইচে যারা তাদের মত
নাইতে যেত যদি,
জল আন্‌তে যেত পথে
কোথায় গঙ্গা নদী।
খেল্‌ত যে সব ছেলে গুলি
ডাক্‌ত যদি তারে।
তাদের সাথে খেল্‌ত সুখে
তাদের ঘরে দ্বারে।

মনে হ'ত তোমার ছায়ে
কতই কিযে আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাক্‌ত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম!
কেন হলেম পর?
(তারা) ছায়ার মত ছায়ায় থাকে
পাতার মর মরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে!
দূরে বাজে মুলতান
পড়ে আসে বেলা,
(তারা) ঘাসে বসে দেখে জলে
আলো ছায়ার খেলা।
সন্ধ্যে হলে চুল বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় ছুলি ছুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারি ভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্রতনু—
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিত মশাই,
বেত হাতে নাইক বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা।

আজকে কেন নাইক তারা ?
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙ্গে
কোথায় গেছে চলে !
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙ্গে দিল কে ?
ছায়া কেবল রৈল পড়ে,
কোথায় গেল সে ?
ডালে বসে পাখীরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে ?
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ?
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে,
পাখীর সঙ্গে মিলে মিশে
ছিল চুপেচাপে,—
দুপুর বেলা নুপুর তাদের
বাজ্‌ত অনুক্ষণ,
(শুনে) ছোট দুটি ভাই ভগিনীর
আকুল হ'ত মন।
(আহা) ছেলে বেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে !
(তারা) গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসি পিসির দেশে !

প্রবাসের চিঠি।

যে অনেক দূর বিদেশে একটী কোণে পড়ে আছে তাকে দেশের অনেক গুলা কথা বর্ষার কথা মনে করে দেওয়া ঠিক সুহৃতের কাজ নয়। কিন্তু এটাও বলি যে বর্ষার সময় প্রবাসী বন্ধুকে মনে করা যথার্থ সুহৃতের কাজ বটে।

সিন্ধুদেশে আছি বলিয়া দেশের কিছু যে ভুলিয়া গিয়াছি তা নয়। বরং কল্পনায় সে সব ছবি আরও স্পষ্ট দেখি। সেই সব গাছপালা, সেই বাড়ী ঘর দোর, সেই নদী, সেই জ্যোৎস্না, সব যেন চক্ষের সমুখে ভেসে বেড়ায়। এমন কি, এক এক সময় কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাত হয়।

স্বদেশের উপর অনুরাগ মস্ত গুণ বটে। কিন্তু সেটা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় না মহৎ স্বভাবের লক্ষণ ভাল ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিশেষ আজ কাল "United India" কথাটা যার তার মুখে। ভারতমাতার সে মলিন মূর্ত্তি আর সে শ্মশান ভস্ম গিয়া এখন একটা নূতন, জাগ্রত, মিলিত ভারত খাড়া করা হয়েছে। সব ভাই ভাই। সব কণ্ঠ একত্রে মেশে। হিমালয় পাহাড়ে যে রব ওঠে, কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, কলিকাতায় যে ধুয়া উঠে, তাহার ঢেউ কাগজে পত্রে, বক্তৃতায় বাহিত হইয়া সিন্ধুদেশে লাগে। সমগ্র ভারতবর্ষ যে এক জাতির আবাস তাহার আর সন্দেহ কি! দোষের মধ্যে এই যে সুবে বাঙ্গালার বাহিরে পা দিলেই 'প্রবাস' কথাটা জিবের আগায় আসিয়া উপস্থিত হয়। যেখানে দেখি দেশের মত কিছুই নাই সেখানে যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। মাতৃভূমি যে স্বর্গের চেয়ে বড় সেটা শুধু গৌরবের কথা নয়, বোধ হয় তাতে আট আনা স্বার্থপরতা মিশ্রিত আছে। মাতৃভূমি ছাড়িয়া যে স্বর্গেও যাইতে ইচ্ছা করে না তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়।

দেশের বর্ষা মনে পড়ে বই কি। চারিদিকে সব ভিজে ভিজে, মনটার যেন ভিজে-ভিজে ভাব। বাড়ীর উঠানে শ্যাওলা, দেয়ালের রং ধুয়ে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করেছে। ঘরের ভিতর জিনিসপত্র গুলাতে ছাতা ধরেছে, বাড়ীর ঝি বউ, ছেলেপিলে, দাসদাসী আনাগোনা করতে দুম্‌দাম করে আছাড় খাচ্চে, তার পর চুণহলুদের পালা। গ্রামের ভিতর সরু সরু পথ, তার উপর মোটা মোটা সবুজ সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠেছে, চারদিকে আসসেওড়া, বাগভেরেণ্ডা, কালকাসান্দার গাছে জমি ঢেকে ফেলেছে। পুকুরের পইটা গুলা জলে সব ডুবে গিয়েছে, বাড়ীর ঝি বউদের আর সিঁড়ী ভাঙ্গিতে হয় না। পুকুরের শ্যাওলা বৃষ্টির চোটে পুকুরের পাড়ে জমা হয়ে রয়েছে, আর চারিদিকে গুগ্‌লি শামুক বেশ ধোয়া ধোয়া মাজা মাজা দেখাইতেছে। পুকুর ধারে চাঁপাফুলের গাছ, ফুলগুলি তলায় পড়ে। গন্ধ পুকুরপারে পাওয়া যায়। আবার সেখানে একটা গাব গাছ কালো কুচ্‌কুচে পাতা বৃষ্টিতে ধুয়ে আরও কালো দেখাইতেছে। গঙ্গার ঘোলা ঘোলা মূর্ত্তি, ছোট বড় অসংখ্য আবর্ত্ত—গ্রীষ্মের সে স্বচ্ছ শীতল মন্দবেগ জল আর নাই। একটানা স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে—দেখিলে মনে পড়ে ঐরাবতের দর্প এই তৃণখণ্ডকারী অপ্রতিহত বেগের নিকটে কেমন অবলীলাক্রমে পরাভূত হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ছিল, বর্ষার বেগে তাহার মূল উৎপাটিত হইয়াছে। গাছের পাতা পচিয়া সমস্ত খসিয়া গিয়াছে, ডালপালা কতকগুলা জলের ভিতর পড়িয়াছে, কেবল স্রোতো-

বিধৌত মূল সকল জাগিয়া রহিয়াছে। শিকড়গুলি সাদা সাদা, এক এক জায়গায়—যেখানে জলের স্রোত লাগে না—আবার দুটি একটী কিশলয় দেখা যাইতেছে।

তার পর কলিকাতার বাদলা—ভাল মনে করে দিয়েছেন। এমন সুখের বাদলা ত আর কোথাও হয় না। ফোঁটা দুই বৃষ্টি হলেই ত রাস্তাগুলি নদী-বিশেষ আর বাড়ী-গুলা তার মধ্যে দ্বীপের মত হয়। কল্‌কাতায় বাড়ীতে বসে বৃষ্টি দেখ্‌তে ত মন্দ নয়। কিন্তু বৃষ্টির সময় ছাতি ঘাড়ে করে বড়বাজারের চকে কোন দিন গিয়েছিলেন? চার ইঞ্চি পুরু দইয়ের উপর মানুষ গুলা যেন সন্দেশের মত ভেসে বেড়ায়। কিন্তু সে কাদার স্রোত দেখ্‌লে সাক্ষাৎ বৈতরণী মনে পড়ে। চিৎপুর রোড্, সরু সরু গলিগুলা নরক বল্‌লেই হয়।

গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছি। প্রবাসের চিঠি লিখিতে বসিয়া সটান দেশের কথা বলিয়া যাইতেছি। কিন্তু প্রবাসীর মুখে দেশের দুটা কথা শুন্‌লে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়।

সিন্ধুদেশ মরুভূমি, আর এখানে বৃষ্টিও হয় না। এ কথাটা মনে ধারণা হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয়, কিন্তু একেবারে ঠিকও নয়, এ দেশে স্থানে স্থানে অত্যন্ত উর্ব্বরা ভূমি আছে। সিন্ধু নদের তীরে এক এক জায়গার স্বভাব-সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। বৃষ্টি খুব কমই হয় বটে কিন্তু অনাবৃষ্টি নাই। শীকারপুরের দিকে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না।

কিন্তু করাচির পক্ষে ইহার একটা কথাও খাটে না। সমস্ত সিন্ধুদেশে এমন সুখের জায়গা আর নাই। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তর এবং নিত্য বাড়িতেছে। এ প্রদেশের রাজধানী এইখানে। বহুসংখ্যক ইংরাজ ও অন্যান্য জাতীয় ইয়োরোপীয় এইখানে বাস করেন। সহর বড়, সহরের সমুদয় সুখ আছে। বড় বাড়ী অনেক। দেখিতে দেখিতে প্রাসাদ সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে।

করাচি সমুদ্র তীরে স্থিত। সিন্ধুদেশের শীত গ্রীষ্ম এখানে মোটেই অনুভব করা যায় না। কখন কদাচ পাহাড়ে বাতাস আসিলে দুই চারি দিন বেশী শীত বা গরম হয়, সমুদ্রের বাতাস বৎসরে আট নয় মাস ক্রমাগত বয়। যে সমুদ্রের বাতাস সুন্দরবনের পচাপাতার গ্যাস লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দখিনা বাতাস নামে অভিহিত হয়, যে বাতাস সেবন করিয়া লোকে চরিতার্থ হয়, সেই বাতাস টাট্‌কা আমাদের গায়ে লাগে। করাচি সমুদ্রের ঠিক ধারে বলিয়া আকাশ সকল সময়ে খুব পরিষ্কার থাকে না। বাতাস জলপূর্ণ ও আর্দ্র বলিয়া আকাশ একটু ঘোলা ঘোলা দেখায়।

করাচিতে অন্য স্থানের চেয়ে বৃষ্টি কিছু অধিক হয়। এ বৎসরও মন্সুন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ আছে। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে বোম্বাই অঞ্চলে এবং উত্তর ভারতে বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে। বোম্বায়ে বৃষ্টি পড়িতে প্রায় একমাসের

অধিক বিলম্ব হইয়াছে। এখানে এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। রোজ মেঘে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসে, রোজ আকাশের ঘটাখানা খুব জাঁকাল হয়, প্রায়ই দুটি চারটী ফোঁটাও পড়ে, কিন্তু বৃষ্টি আর হয় না। তাহা হইলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টরের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হইবে। ইংরাজকে দেবতাও ভয় করে। সে দিন যে কলিকাতার ভূমিকম্প হইয়া গেল, ইংরাজ ছাড়া আর কাহারও রাজ্য হইলে বোধ হয় সহরটা ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। লাট সাহেব স্বয়ং কলিকাতায় থাকিলে বাসুকী মাথা নাড়িতে সাহস করিতেন কি না তাহাই সন্দেহ।

মন্‌সুন আসিয়া সমুদ্রের মূর্ত্তি ফিরিয়াছে। এই সে দিন আমরা ক্লিফ্‌টনে গিয়া সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। যতদূর চাহিয়া দেখি—এমনি প্রশান্ত, স্থির, নীল, গম্ভীর, বিরাট মূর্ত্তি যে আর কি বলিব। সমুদ্র গর্জ্জন যেন বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে, প্রায় শোনা যায় না। তীরে জমাট বালি, তক্‌তক্ করিতেছে, জ্যোৎস্না রাত্রে দেখিতে ঠিক আরসীর মত। ঢেউগুলি এমনি ছোট ছোট, এমনি কুলকুল করিয়া আস্তে আস্তে গড়াইয়া আসে, যে তাহা দেখিয়া সমুদ্রের বড় ঢেউ কল্পনা করাই কঠিন হইয়া ওঠে। মনোরা নামে একটা ছোট দ্বীপ আছে। সেইখানে ব্রেক্‌ওয়াটর ও লাইটহাউস আছে। শীতকালে আমরা গিয়া দিব্য ব্রেকওয়াটরের উপর বেড়াইয়া আসিলাম। কিছুই ভয় নাই, কেবল অসাবধান হইলে দু একবার গায়ে একটু আধটু জলের ছিটা লাগে। আর এখন! ক্লিফ্‌টনের সে তক্‌তকে বালি জলময় হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ, ঢেউয়ের মুখে রাশি রাশি ফেনা। নিরেট জলের তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ফেন হইয়া ছত্রাকার হইয়া পড়িতেছে। গাঢ় নীল জল তার উপর অতি শুভ্র ফেনা, তরঙ্গের অবিশ্রান্ত উত্থান পতন, অবিশ্রান্ত ফেন উদ্গীরণ, অবিশ্রান্ত গভীর গর্জ্জন। চারিদিকে জলকণা উঠিতেছে, সুক্ষ্ম বাষ্পরাশি বাতাসের সঙ্গে মিশিতেছে। দু-একটী ছোট ছোট বালীর পাহাড়—কালক্রমে কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই পাথরের উপরে কত লোকে কত কি খোদিয়া আসে। এখন তার উপর জল উঠিয়াছে। ছোট পাহাড়ে ছোট ছোট গর্ত্ত—তাহাতে জল পূরিয়া গিয়াছে।

ব্রেকওয়াটরের এখন ভীম শোভা। যদি সমুদ্রের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত এই সময় আসিয়া দেখিতে হয়। সে কাণ্ড বর্ণনা করে কার সাধ্য। তাল গাছ সমান ঢেউ রূপকথা নয়। ব্রেকওয়াটরের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখাও বড় সোজা নয়। ঢেউ নিকটে নাই দেখিয়া নিকটে যাইতে হয়, আবার ঢেউ আসিছে দেখিলেই পালাইতে হয়। যতদূর দেখা যায় সমুদ্রগর্ভ ভয়ানক আলোড়িত বোধ হয়। সমুদ্রের বুক ফুলিয়া উঠিতেছে। যেন কোন মহাকায় রাক্ষসের নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিতেছি। সমুদ্র যে জীবন্ত দানব নয় এ কথা মনেও হয় না। সে মহাতরঙ্গের দোলন, সে শত

সহস্র সর্পফণাতুল্য উত্থিত তরঙ্গের মাথায় ফেনের কুঞ্চন, সে প্রচণ্ড আঘাত দেখিয়া মানুষের গর্ব্ব কোথায় থাকে! সে আসুরিক আস্ফালন, সে শ্রবণবিদারী গর্জ্জন, সে অজস্র অশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ বড় ভয়ানক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বারম্বার প্রহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, কত রকম জলজন্তু তরঙ্গবেগে নীত হইয়া শৈলের উপর চূর্ণিত হইতেছে। আবার সেই প্রতিঘাত, আবার সেই ফেনপুঞ্জ, আবার সেই গর্জ্জন। অথচ কোন ক্লেশ নাই, বেগ ও প্রচণ্ডতার হ্রাস নাই, তরঙ্গের খর্ব্বতা নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই। সেই এক অক্লিষ্ট, প্রকাণ্ড নীল মূর্ত্তি। সেই ক্রীড়াশীলতা, সেই আয়াসশূন্য ভাব সর্ব্বদাই রহিয়াছে। পাহাড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, লোহার রেলিং খড়ের মত খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে,—সবই অবলীলা ক্রমে। কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্যে, এই মহা প্রকৃতি সমরের মধ্যে কেমন একটা শান্তির ভাব আছে, আমার মনে সেইটা বড় লাগে। যেন একটা অবিচলিত বিশ্বব্যাপী শান্তি হইতে এই সকল অশান্তির উৎপত্তি, এবং শান্তিই সকল অশান্তির সীমা। শান্তিই সমুদয় প্রকৃতির নিয়ম, অশান্তি তাহার বিকার মাত্র।

আবার দেশের বর্ষা মনে পড়িতেছে। ছেলেবেলার কেমন বৃষ্টি হইলেই সেই জলে স্নান করিতে ছুটিতাম। অসময়ে স্নান করিয়া কখন কখন জ্বর হইত। এখনও বৃষ্টির জলে নাইতে ইচ্ছা করে, এখনও সুবিধা পাইলে স্নান করি, কিন্তু লোক দেখিলেই লুকাই। ভয় আছে লোকে ছেলেমানুষ বলিবে। বৃষ্টি পড়িলে এখন মুড়ি আর নারিকেল খাইতে ইচ্ছা করে?

বর্ষার সময়টা সব কিছু ঘরের ভিতর আসে। রূপকথা বর্ষার সময় শুনিতে যেমন ভাল লাগে এমন আর কোন সময় নয়। আপনার যা কিছু আছে বর্ষার কাছে আনিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে সবাই মিলিয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বাহিরের বৃষ্টি দেখি। প্রবাসী বর্ষাপ্রারম্ভে ঘরে ফিরিবে কতকাল ধরিয়া এ নিয়ম রহিয়াছে। বসন্তের বিচ্ছেদ কবিরা বলেন বড় গুরুতর, কিন্তু বর্ষার বিচ্ছেদ আরও কঠিন। একটা গান আছে ঃ—"সঁইয়া ঘর না আয়ে বরষ গয়ে বদরা।"

'সঁইয়া' কি শুধু প্রণয়ী! আমার ত এমন বোধ হয় না। নহিলে সঁইয়া কাছে থাকিলেও বর্ষার সময় ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে কেন? তা নয়, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।" যে যেখানে আপনার আছে সকলকে একত্র জড় করিতে ইচ্ছা করে, সকলে বসিয়া ছেলেবেলাকার গল্প করিতে ইচ্ছা করে, কে কয়বার বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছিল, কে কয়বার শিল কুড়াইয়া খাইয়াছিল, কে কয়বার আছাড় খাইয়াছিল, তাহার হিসাব আবার নূতন করিয়া করিতে ইচ্ছা করে। যে সব পুরাতন স্মৃতি সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেই গুলিকে একে একে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। বর্ষার সময় ঠাকুরদাদার ক ছিলিম তামাক বেশী পুড়িত ও কয়টা গল্প বেশী বাহির

হইত সেটা আবার মনে আসে। বাহিরের জ্বালা যন্ত্রণা, অসংখ্য ঝঞ্ঝাট যেন বাহিরে পড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে থাকে। সে গুলা সব যেন ভাদ্র মাসের তালের নীচে চাপা পড়ে। আর আমাদের ছেলেবেলাকার সুখ দুঃখ, আমাদের সব আপনার বন্ধু বান্ধব সমস্ত হৃদয় দখল করিয়া ফেলে। আর সেই পুরাণো কাহিনীর তালে তালে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে।

রাজর্ষি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্তাধীন, শেষ আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য্যবেগে এমন সকল কথা উঠিতে লাগিল যাহা তাঁহার অশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিং পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নের মত ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে কালীকে জয়সিং এতদিন মা বলিয়া জানিতেন গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন! শক্তির সন্তোষই কি আর অসন্তোষই কি! শক্তির চক্ষুই বা কোথায় কর্ণই বা কোথায়! শক্তি ত মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ কর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কি জানিবে!—তাহার সারথী কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিনী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা নির্ব্বাণ করিতে হইবে এই কি আমার ব্রত! কেন? সে ত আপনার কাজ আপনিই করিতেছে—তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরা মারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দ্দয় মানবহৃদয়স্থিত হিংসা আছে, ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কি!

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্য-কিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে

নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চীল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোষ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলে মেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিং মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিং প্রতিমার দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে কহিলেন—"কেন মা, আজ্ এমন অপ্রসন্ন কেন? এক দিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রূকুটি! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, ভক্তির কি কিছু অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধীর শোণিত চাই? আচ্ছা, মা, সত্য করিয়া বল্ দেখি, পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্, হাঁ কি না!"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল "হাঁ"। জয়সিং চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মত কি একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোমতী নদীর দক্ষিণদিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোট ছোট স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহা গহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বড় বড় শাল ও গাম্ভারি গাছে এই শতধা বিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এই জমি টুকুর মধ্যে বড় গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে ঢিপির উপর ছোট ছোট শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক হাত দুই হাত প্রশস্ত ছোট ছোট জল

স্রোত কত শত আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলিয়া বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জ্জন—এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী এবং তাহার পরপারের বিচিত্র বর্ণ শস্যক্ষেত্র সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রতি দিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটি অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখন কখন গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহাদের সৌম্যমূর্ত্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না কিন্তু বর্ষা-উপশমে যে দিন আসিতেন সেদিন ছোট তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে ত আর নাই। পাঠকদের কাছে তাতা শব্দের কোন অর্থই নাই—কিন্তু হাসি যখন সকাল বেলায় শালবনে দুষ্টুমি করিয়া শালগাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণস্বরে "তাতা" বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত—দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত—তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত, তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখীর মত স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত—তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখীর গান লুটিয়া লইত—প্রভাত-প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্য্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই—বালকটি আছে কিন্তু "তাতা" নাই, বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু "তাতা" কেবলমাত্র সেই বালিকারই।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্ব্বে একা গোমতী তীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে—তাহার বড় বড় দুটি নীরব চক্ষের সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্ত্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান; সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ-চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে

ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক, সপ্তলোকের সঙ্গীতের আভাস শুনা যায়—সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়, কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়—উৎকট ভাবনা চিন্তা অসুখ অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে নির্জ্জনে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন। সে যে বড় একটা কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে—কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধ-আধ স্বরে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল—"আমিও বনে যাব।"

রাজা বলিলেন—"কি কর্ত্তে বনে যাবে?"

ধ্রুব বলিল—"হরিকে দেখ্‌তে যাব।"

রাজা বলিলেন—"আমরাত বনে এসেছি, হরিকে দেখ্‌তে এসেছি!"

ধ্রুব—"হরি কোথায়।"

রাজা—"এইখানেই আছেন।"

ধ্রুব কহিল—"দিদি কোথায়।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল দিদি যেন আগেকার মত পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে, কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়।"

রাজা কহিলেন—"হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েচেন।"

ধ্রুব কহিল—"হরি কোথায়!"

রাজা কহিলেন—"তাঁকে ডাক বৎস। তোমাকে সেই যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বল।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল।

হরি তোমায় ডাকি—বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাইহে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি ডাকি হরি হরি
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,

তোমায় সবে বলে ভকত বৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখি তারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথ হারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুব তারা
আর কার পানে চাই হে॥

"র"য়ে "ল"য়ে "ড"য়ে "দ"য়ে উলট্ পালট্ করিয়া অর্দ্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া অর্দ্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল। চারিদিকে নদীকানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনক সুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে—তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারিদিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্য্য কিরণের ন্যায় দশদিকে বিকীরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময়ে সশস্ত্র জয়সিং গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দুইহাত বাড়াইয়া দিলেন, কহিলেন, "এস, জয়সিং, এস।" রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজমর্য্যাদা কোথায়! জয়সিং রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"জয়সিং তুমিইত আমার প্রণম্য। তোমার রাজবংশে জন্ম, তুমি ক্ষত্রিয়।"

জয়সিং কহিলেন—"মহারাজ এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন—"কি বল।"

জয়সিং—"মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন!"

রাজা—"কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কি করিয়াছি?"

জয়সিং—"মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন—"কেন, জয়সিং—কেন এ হিংসার লালসা! আজি এই সুমধুর প্রভাতে কেন এ হিংসার উচ্ছ্বাস! চাহিয়া দেখদেখি, মায়ের কোলে সমুদয় জীবজন্তু কি আরামে নিঃশঙ্কে আনন্দে বিচরণ করিতেছে, ঐ কোলে ত্রাস শোক হাহাকার তুলিয়া ঐ মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও! জগতের শান্তি-নাশ করিতে কেন এত বাসনা! কেন হিংসা বিষকণ্টকের মূলে জীবশোণিত ঢালিয়া তাহাকে সযত্নে বর্দ্ধিত করিতেছ! কোথায় করুণার কল্পতরু, কোথায় প্রেমের পারিজাত!"

জয়সিং ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিং কহিলেন—"কেন মহারাজ, শাস্ত্রেত বলিদানের ব্যবস্থা আছে।"

রাজা কহিলেন "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে! আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে!—যখন কালীর সম্মুখে আর্ত্ত অসহায় জীবের বলিদান হয়, সেই বলির সকর্দ্দম রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যখন সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গনে নৃত্য করিতে থাকে তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে! না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসা রাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে, সেই রাক্ষসীকে মা বলে, সেই রাক্ষসীটাকে রক্ত খাওয়াইয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।"

জয়সিংহ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্যরাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে। অবশেষে বলিলেন "আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি—এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন তিনি মহারাজের রক্ত চান।" বলিয়া জয়সিং প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন। রাজা হাসিয়া বলিলেন "এ ত মায়ের আদেশ নয় এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন!"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিং একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মত উঠিয়াছিল কিন্তু আবার বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল। জয়সিং অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন "না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না—আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না—আপনার কথায় আমার চারিদিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস যে ভক্তি ছিল তাই থাক্—তাহার পরিবর্ত্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক্ আর গুরুর আদেশই হউক্ সে একই কথা—আমি পালন করিব।" বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন—তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মত চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—তাহার ছোট দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল—রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিং তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন "কোন ভয় নেই বৎস, কোন ভয় নেই। আমি এই চলিলাম। তুমি ঐ মহৎ আশ্রয়ে থাক ঐ বিশাল বক্ষে বিরাজ কর—তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সহসা আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া

আসিয়া কহিলেন—"মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই—আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনাকে বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন "নক্ষত্র কোন মতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালবাসে।" জয় সিং বিদায় হইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীর মুখে কহিল "দিদি কোথায়।"

এমন সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মন্দির অধিক দূরে নয়। কিন্তু জয় সিং বিজননদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি অথচ সংশয় যাইতেছেনা। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে! কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে? সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ! প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি আজ আমার যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেছে!" জয় সিং যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে—'বাপ পিতামহর কাল থেকে এই ত চলে আস্‌চে জানি আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠ্‌ল!"

যুবা বলিতেছে—"এখন আর মন্দিরে আস্‌তে ইচ্ছে করে না, পূজোর সে ধূম নেই।"

কেহ কহিল—"এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়াল।" তাহার মনের ভাব এই যে বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মান অত্যন্ত আশ্চর্য্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল—"এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল "পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বল্লেন যে মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল "এই দেখ না কেন, মোধো আজ দেড় বৎসর ধরে ব্যাম ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, বলিও বন্ধ হল অম্‌নি সে মারা গেল!"

ক্ষান্ত বলিল—"তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মর্‌বে এ কে জান্‌ত! তিন দিনের জ্বর। যেমন কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল!" ভাসুর-পোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল—"সে দিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল একখানা চালা বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল "অত কথায় কাজ কি, দেখ না কেন এবার যেমন ধান শস্তা হয়েছে এমন অন্য কোন বছর হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্ব্বেও যাহার যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে তাহার একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না বটে কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয় সিং অন্যমনস্ক ছিলেন ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিং কাতর অথচ দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"মা ত আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিং কহিলেন—"আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "চুপ কর! আমি কি ভাবিয়া কি করি তুমি তাহার কি বুঝিবে? বাচালের মত যাহা মুখে আসে তাহাই বলিও না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না!"

জয়সিং চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার

ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই তখন মহারাজার নিকট নক্ষত্ররায়ের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।”

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্বেলিত ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে জয়সিংহকে বলিলেন “মন্দিরে প্রবেশ কর।”

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন “মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর—বল যে ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।”

জয়সিং ঘাড় হেঁট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব!”

গান অভ্যাস।

বালকের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত হওয়াতে গান শিক্ষার সংকেতগুলি পুনরায় প্রকাশ করা হইল।

রে স্বর কোমল হইলে রে না লিখিয়া ঋ লিখিতে হইবে। গা স্বর কোমল হইলে গা না লিখিয়া সেই স্থলে গ লেখা যাইবে। ধা স্বর কোমল হইলে ধা না লিখিয়া ধ লিখিত হইবে। নী কোমল হইলে দীর্ঘ নী’র পরিবর্ত্তে নি লিখিতে হইবে। ম স্বর কড়ি হইলে ম না লিখিয়া মা লিখিতে হইবে।

মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকিবে না, উপরের সপ্তকের স্বরের মাথায় কসি থাকিবে এবং নিম্ন সপ্তকের স্বরের নীচে কসি থাকিবে।

গানের পদের একেকটি ভাগের পর একেকটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে এবং একেকটি পদের পর দুইটী করিয়া দাঁড়ি থাকিবে। একেকটী স্বর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে ততগুলি কসি চিহ্ন তাহার পার্শ্বে স্থাপিত হইবে। সহজে একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। তালের বিভাগ—১, ২, ৩, ০, যথাস্থানে স্বরের মাথার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গানের যে অংশটুকু দুই বিন্দুযুক্ত দাঁড়ির মধ্যে (।।: :।।) লিখিত হইবে তাহা দুইবার করিয়া গাহিতে হইবে।

“বেলা যে চলে যায়” এই গানটীর তাল যৎ। ইহাতে চারিটী করিয়া তাল থাকে।

ইহার প্রত্যেক ভাগে দুটী তাল থাকে এবং সেই দুইটী তাল পাঁচটী মাত্রা লইয়া থাকে। প্রথম ও তৃতীয় তাল প্রত্যেকে তিনটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাল প্রত্যেকে দুইটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।—

কোমল গান্ধারকে সুর করিয়া স্বরলিপি রচিত হইল।

এবারে আমরা কাল-মৃগয়া নামক গীতি-নাট্য আনুপূর্ব্বিক স্বরলিপিতে বদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গকে ক্রমশঃ উপহার দিব।

কাল-মৃগয়া।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন।

ঋষিকুমারের প্রবেশ।

রাগিণী মিশ্রভূপালী—তাল যৎ।

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়।
লীলা, লীলা, খেলাবি আয়।

লীলার প্রবেশ।

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

লীলা। ও ভাই দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি।
ঋ-কু। তুই আয়রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি।
তোর হাতে মৃণাল বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল।
তোর মাথায় বেলের সীঁথি
তোর খোপায় বকুল ফুল।

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল খেমটা।

লীলা। ও, দেখবিরে ভাই আয়রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে,

রাশি রাশি হাসির মত
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়,
ও ভাই সাবধানেতে আয়রে হেথা,
দিস্‌নে দ'লে পায়!

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল খেম্‌টা।

লীলা। কাল সকালে উঠ্‌ব মোরা
যাব নদীর কূলে,
শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আন্‌ব কুসুম তুলে।

ঋ-কু। মোরা, ভোরের বেলা গাঁথ্‌ব মালা
দুল্‌ব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধোরে,
মা ব'লেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দিবে তোরে।

ঋ-কু। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই
এখন যাই ফিরে,
একলা আছেন্ অন্ধ পিতা
আঁধার কুটীরে।

রাগিণী মিশ্র ভুপালী—তাল যৎ।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
পা— —নি০ধা০নি—পা। ম—ম—গ০রে০গ—সা —। গ — গ — ম০গ০ম০গ০ম —।
বে লা যে চ লে যায় ডু বি ল র
০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩
পা— — — — —। পা— —পা— —পা—। নি—ধা০নি০পা—ম— —। ম—পা—নি—
বি ছা য়ায় ঢে কে ছে ঘ ন অ

সা—গা—। ম৹ম৹গ৹গ৹সা৹নি৹পা৹ম৹গ৹ম৹। পা——নি৹ধা৹নি—পা—। ম—ম—
ট বী বে লা যে চ লে

গ৹রে৹গ—সা—। গ——রে৹গ৹ম—গ—। রে—সা—নি—পা——। পা—সা—
যায় কো থা সে লী লা গে

নি—ধা—নি—। পা—ম—গ——ম—। গ——রে৹গ৹ম—গ—। রে—সা—নি—
ল কো থায় কো থা সে লী লা

পা——। পা—সা—নি—ধা—নি—। পা—ম—গ———। নি—সা—গ——সা—।
গে ল কো থায় লী লা

সা—রে—ম———। গ—রে—সা——নি৹ধা৹। পা—ম—গ——ম—।
লী লা খে লা বি আয়

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

গ—নি——গ—। গ——সা——। নি ——গ—। গ——নি——। গ——নি——।
ও ভাই দে খে যা ক ত ফুল্

নি—ধ—ধ——। পা————। ——নি——। গ———নি—। গ——ম——।
তু লে ছি তুই আয় রে কা ছে

ধ৹ধ৹পা৹ম৹——। ——পা—ধ—। নি——গ——। পা——ম——। গ————।
আয় আমি তো রে সা জিয়ে দি

——পা—ধ—। নি———সা—। নি——ধ——। পা——ধ——। নি——
তোর্ হা তে মৃ ণাল্ বা লা

নি——। সা————সা—। নি—ধ—পা—ম—। মগ————ম—। রে——
তোর্ কা নে চাঁ পার্ ফুল্

নি——। গ———নি—। গ——ম——। পা—ধ—ম———। ——পা—ধ—।
তোর মা থায় বে লের আঁ খি তোর্

নি——গ———। পা———ম———। গ————————। ————————।
খো পায় ব কুল ফুল্

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল খেমটা।

৩ ২ ৩ ০ ১
— —নি—। গ— —রে—। সা৹নি৹সা— —। ধ— —নি—। পা—ধ— —।
ও দেখ্ বি রে ভাই আয়্ রে ছু টে

২ ৩ ০ ১ ২
নি—গ— —। ধ—পা—ধ—। ম— —পা৹ম৹। গ— — —। গ—গ—ম—।
মো দের ব কুল্ গা ছে রা শি

৩ ০ ১ ২ ৩
ম—ম— —। ম—ম—পা—। ধ—নি— —। নি— —সা—। ধ—রি—সা—।
রা শি হা সির্ ম ত ফুল ক ত ফু

০ ১ ২ ৩ ০
নি— —ধ—। পা— —নি—। গ— —রে—। সা৹নি৹সা— —। ধ— —নি—।
টে ছে ও দেখ্ বি রে ভাই আয়্ রে

১ ২ ৩ ০ ১
পা—ধ— —। নি—গ— —। ধ—পা—ধ—। ম— —পা৹ম৹। গ—নি—নি—।
ছু টে মো দের ব কুল্ গা ছে ক ত

২ ৩ ০ ১ ২
গ—সা— —। রে—নি— —। গ—সা— —। রে—নি— —। গ—রে—গ—।
গা ছের ত লায় ছ ড়া ছ ড়ি গ ড়া

৩ ০ ১ ২ ৩
ম—গ—রে—। সা— — —। —নি—নি—। নি—গ—রে—। সা৹নি৹সা— —।
গ ড়ি যায়্ ও ভাই সাব্ ধা নে তে

০ ১ ২ ৩ ০ ১
ধ— —নি—। পা— —ধ—। নি— —গ—। ধ—পা—ধ—। ম— —পা৹ম৹। গ— — —।
আয়্ রে হে থা দিস্ নে দ লে পায়

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল খেমটা।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
গ— —গ—। গ—পা— —। ম—পা—গ—। ম—পা— —। গ—গ— —। পা—নি— —।
কাল্ স কা লে উঠ্ ব মো রা যা ব ন দীর

০ ১ ২ ৩ ০ ১
সা—সা— —। — — —। সা—গ—গ৹রে৹। সা—নি৹ধা৹নি—। পা— —গ—। ম—পা— —
কূ লে শিব্ গ ড়ি য়ে কর্ ব পূ জো

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
গ— —সা—। সা—সা—ম—। ম—গ— —। —গ—গ—। গ—গ৹রে৹গ—। ম—পা— —।
আন্ ব কু সুম তু লে মো রা ভো রে র বে লা

০ ১ ২ ৩ ০ ১
ম—পা—গ—। ম—পা— । গ— —গ—। পা—ম—ধ—। পা— — —। — —।
গাঁথ্ ব মা লা ফুল্ ব সে দো পায়্

২ ৩ ০ ১ ২
সা—গ০রে০গ—। সা—নি০ধা০নি—। পা——গ—। ম—পা——। গ—গ—সা—।
বা জি য়ে বাঁ শি গান্ গা হি ব ব ন্ধু
৩ ০ ১ ২ ৩
সা—ম—ম—। গ———। গ—গ০রে০গ—। নি—পা—গ—। ম—পা——।
লের্ ত লায় না ভাই কাল স কা লে
০ ১ ২ ৩ ০ ১
ম—গ——। ম—পা —। গ—গ——। পা—নি——। সা—সা——। ———।
মা য়ের কা ছে নি য়ে যা ব ধো রে
২ ৩ ০ ১ ২
সা—গ—গ০রে০। সা—নি০ধা০নি—। পা—গ——। ম—পা——। গ—গ—সা—।
মা ব লে ছে শ্ব বির মা জে সা জি য়ে
৩ ০ ১ ২ ৩ ০
সা—সা—ম—। ম—গ——। ———। পা——পা—। নি—সা——। নি—সা——।
দে বে তো রে সন্ ধ্যা হ য়ে এ ল
১ ২ ৩ ০ ১
নি—সা——। গ—গ——। রে০গ০ম—ম—। গ———। রে—সা—নি—।
যে ভাই এ খন্ যাই ফি রে
২ ৩ ০ ১ ২
নি——গ—। রে—গ০রে০গ—। সা—রে—নি—। পা—নি০ধা০নি—। পা০ধ০ম——।
এক্ লা আ ছেন্ অন্ ধ পি তা আঁ ধার্
৩ ০ ১
পা—ম—পা০ম০। গ —। — ।
কু টী রে

শ্রীচরণেষু।

দাদা মশায়, তোমার চিঠি ক্রমেই হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের চোখে এ চিঠি অত্যন্ত ঝাপসা ঠেকে। কোথায় রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচি, অত দূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। তোমরাইত বল আমাদের দূরদর্শিতা নাই—অতএব দূরের কথা দূর করিয়া নিকটের কথা তুলিলেই ভাল হয়।

আমরা যে মস্ত জাতি, আমাদের মত এত বড় জাতি যে পৃথিবীতে আর কোথাও মেলে না, তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বেদ বেদান্ত আগম নিগম পুরাণ হইতে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের বেলুন ছিল, রেলগাড়ি ছিল, আমাদের ষ্টাইলোগ্রাফ পেন্ ছিল গণপতি তাহাতে মহাভারত

লিখিয়াছিলেন, ডারুইনের বহুপূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বানর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য ভৃগু গৌতমের সম্পূর্ণ জানা ছিল, ইহা সমস্তই মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা আমাদের কৌলিন্য লইয়া স্ফীত হইতে থাকিব, সেই ক্ষুদ্র কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব, কাহাকাছির সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না, এমন হইতে পারে না। বাল্যকালে একদিন উত্তমরূপে পোলাও খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে অবশিষ্ট জীবন ভাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে, এ বড় দুঃখের বিষয়, এখন সকাল সকাল এই দুঃখ সারিয়া লইয়া বর্ত্তমান যুগের কাজ করিবার জন্য একটু সময় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি, তখন আমি রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচির কথা মনেও করি নাই—কীটের মত যেখানকার যত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে আমার উৎসাহ নাই। আমি অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কথাই বলিতেছি। তর্ক বিতর্কের প্রবৃত্তি দূর করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, মহৎভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া, মহৎ ভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার জন্য আমাদের দেশে কয়জন লোক আত্মসমর্পণ করে! কেবল দলাদলি, কেবল আমি আমি আমি এবং অমুক অমুক অমুক করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে, দেশের কোন কাজ কোন মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এই জন্য আপনাপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড় চৌকি দেয় নাই, অতএব এ সভায় আমি থাকিব না, আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না, সে সমাজের সেক্রেটারি অমুক অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিসের খ্যাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না, আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম, সে এবং তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ সংখ্যক পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবী করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না—কোন ব্যক্তিবিশেষকে বাধিত করিলাম না—আমি রহিলাম কলিকাতার এক কোণে, বীরভূমের এক কোণে এক ব্যক্তি আমার টাকায় মাসখানেক ধরিয়া দুইমুঠা ভাত খাইয়া লইল—ভারি ত আমার গরজ! পরোপকারী বলিয়া নাম বাহির হয় কার? যে ব্যক্তি আশ্রিতদের উপকার করে। অর্থাৎ, একজন আসিয়া কহিল—মহাশয় আপনার হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার একটা গতি করিতে পারেন—আমি আপনাদেরই আশ্রিত;

মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়গুড়ি হইতে ধূম্রাকর্ষণ পূর্ব্বক অকাতরে বলিলেন—"আচ্ছা!" বলিয়া পত্র যোগে একজন বিশ্বাসপরায়ণ বান্ধবের ঘাড়ে সেই অকর্ম্মণ্য অপদার্থকে নিক্ষেপ করিলেন। আর একজন হতভাগ্য অগ্রে তাঁহার কাছে না গিয়া পাঁচুবাবুর কাছে গিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে কাণাকড়ির সাহায্য করা চুলায় যাক, বাক্যযন্ত্রণায় তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। আপনার স্থূল উদরটুকু ধারণ করিয়া এবং উদরের চতুষ্পার্শে সহচর অনুচরগণকে চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যে ব্যক্তি বিপুল শনিগ্রহের মত বিরাজ করিতে থাকে আমাদের এখানে সে ব্যক্তি একজন মহৎ লোক। মহত্বের সীমা উদরের চারিপাশের মধ্যেই অবসিত। আমাদের মহত্ব ব্যাপক দেশে ব্যাপক কালে স্থান পায় না। অত কথায় কাজ কি, উদার মহত্বকে আমরা কোন মতে বিশ্বাস করিতেই পারি না। যদি দেখি কোন এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশী মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি "হুজুকে!" আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড় কাজ একটা হুজুক বই আর কিছু নয়। আমরা টাকাকড়ি ক্ষুধাতৃষ্ণা এ সকলের একটা অর্থ বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্য জ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি—কিন্তু মহৎ কার্য্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোন অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও ব্যক্তি দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোন একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি ত বলি, ওর একটা মৎলব আছে। মৎলব ত আছেই! কিন্তু মৎলব মানে কি কেবলই নিজের উদর বা অহঙ্কার তৃপ্তি ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন উচ্চতর মৎলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না! এম্নি আমাদের জাতির হৃদয়গত বদ্ধমূল ক্ষুদ্রতা! কিন্তু এদিকে দেখ রামহরি বা কালাচাঁদের উপকারের জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে এরূপ নিঃস্বার্থভাব দেখিলে আমরা তাহার প্রশংসা করিয়াই থাকি, অথচ, মানবজাতির উপকারের জন্য আপিষ কামাই করা—এরূপ অবিশ্বাসজনক হাস্যজনক প্রস্তাব আপিষকোটরবাসী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী পেচকের নিকটে নিতান্ত রহস্য বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রবন্ধ দেখিলে বাঙ্গালী পাঠকেরা ক্রমাগত ঘ্রাণ করিয়া করিয়া সন্ধান করিতে থাকে ইহা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত! সমাজের কোন কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ইহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না—এই উপলক্ষ্য করিয়া কোন শত্রুর প্রতি আক্রমণ করা ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত, মনুষ্যস্বভাব অর্থাৎ বাঙ্গালী স্বভাব সঙ্গত বলিয়া সকলের বোধ হয়। এই জন্য অনেক বাঙ্গলা কাগজে ব্যক্তিবিশেষের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া উঞ্ছবৃত্তি করা হয়—যা'কে তা'কে ধরিয়া তাহার উকুন বাছিয়া বা উকুন বাছিবার ভান করিয়া বাঙ্গালী দর্শকসাধারণের পরম আমোদ উৎপাদন করা হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ত বলিয়াছিলাম আমরা ব্যক্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেও পারি কিন্তু মহৎভাবের জন্য শিকি পয়সাও দিতে পারি না। আমরা কেবল ঘরে বসিয়া বড় কথা লইয়া হাসিতামাসা করিতে পারি বড় লোককে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারি, তার পরে ফুড়ফুড় করিয়া খানিকটা তামাক টানিয়া তাস খেলিতে বসি। আমাদের কি হবে তাই ভাবি? অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের অহঙ্কার অভিমান খুব মোটা হইতেছে। আমরা ঠিক দিয়া রাখিয়াছি আমরা সমুদয় সভ্য জাতির সমকক্ষ। আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট—আমাদের রসনার অদ্ভুত রাসায়নিক প্রভাবে জগতে যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবে আমরা তাহারই জন্যে প্রতীক্ষা করিয়া আছি; সমস্ত জগৎও সেই দিকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। দাদামশায়, আর হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র ও দধীচির কথা পাড়িয়া ফল কি বল শুনি! উহাতে আমাদের ফুটন্ত বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র—আর কি হয়?

আমরা কেবল আপনাকে এ'কে ও'কে তা'কে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধূমধাম ছটফট্ বা খুঁৎখুঁৎ করিয়া বেড়াইতেছি—প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—এ সকল আমাদের দেশে কেবল কথারকথা হইয়া রহিল—দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না—কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমাগুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

আমরা আশা করিয়া আছি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ সকল সঙ্কীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থিত ভাল জিনিষটুকু দেখিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণ।

বায়ুস্তরের চাপ।

বাষ্পীয় পদার্থের গুণ এই যে তাহার পরমাণুগুলি একত্র থাকিতে চাহে না, পরস্পরের কাছ হইতে পালাইয়া যাইতে চায়। ঘরের এক কোণে যদি অল্প পরিমাণে গন্ধক জ্বালান যায় তাহা হইলে সেই গন্ধকের বাষ্পের কণাগুলি পৃথক হইয়া অতি অল্প সময়ে

সমস্ত গৃহে ছড়াইয়া পড়িবে। তাই যদি হয় তবে বায়ু অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি যে সকল বাষ্পে রচিত সেই সকল বাষ্পের পরমাণুগুলি পৃথক হইয়া উড়িয়া গিয়া পৃথিবী কেন বায়ুশূন্য হইয়া পড়ে না? কিন্তু পৃথিবী যে শক্তিতে তাহার উপরিস্থিত সমুদয় পদার্থকে টানিয়া রাখিয়া দেয় সেই ভারাকর্ষণ শক্তিতে বায়ুর পরমাণুকে আটক করিয়া রাখে। বায়ুর পরমাণুগুলি ক্রমাগতই উপরের দিকে বাহিরের দিকে পালাইতে চেষ্টা করিতেছে, পৃথিবীও তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। পৃথিবীর কাছাকাছি, অর্থাৎ যেখানে ভারাকর্ষণের টানটা কিছু বেশী, সেখানে বায়ুর পরমাণুগুলি টানের প্রভাবে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবী হইতে যতই উপরে যতই তফাতে গিয়াছে, ভারাকর্ষণের হাত এড়াইয়া বায়ুর পরমাণুগুলি ততই পৃথক হইয়া লঘু হইয়া গেছে। কেবল যে ভারাকর্ষণের প্রভাবেই নিম্নস্তরের বাতাস ঘন তাহা নহে। উপরের বাতাস চাপিতেছে বলিয়া চাপে নিচের বাতাস ঘন হইয়াছে। পৃথিবী ছাড়িয়া আমরা ক্রমে যত উচ্চে উঠি বায়ু ততই আমাদের নিকট পাতলা ও হাল্কা বলিয়া বোধ হইবে। এই জন্য পৃথিবী হইতে অধিক উচ্চে উঠিলে আমাদের নিশ্বাস লইবার অসুবিধা হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গেলুসাক্ নামক একজন ফরাসী বেলুনে করিয়া দুই ক্রোশ উচ্চে উঠিয়াছিলেন। যে পাত্রে এখানকার বাতাস ভরিলে বাতাসের ওজন ৫ সের হয় সেই পাত্রে করিয়া তিনি সেই দুই ক্রোশ উচ্চের বাতাস ভরিয়া আনিয়া দেখিলেন যে সেখানকার বাতাস ওজনে কেবল মাত্র দুই সের। এখন কথা এই বায়ুর শেষ কোথায়? প্রাচীন পণ্ডিতেরা আন্দাজে একরকম স্থির করিয়াছিলেন যে পৃথিবী হইতে ২৫ ক্রোশ (৫০মাইল) উচ্চে বায়ু নাই; কিন্তু পণ্ডিতেরা সম্প্রতি "উল্কাপাত"—অর্থাৎ যাহাকে সচরাচর "তারা খসিয়া পড়া" বলে, তাহার সাহায্যে বায়ুর সীমা স্থির করিয়াছেন। তারা খসিয়া পড়িতে অনেকেই দেখিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক সে যে তারা তাহা নহে। তাহা এক-প্রকার ধাতুময় প্রস্তরখণ্ড সবেগে বায়ুর উপরে পড়িয়া জ্বলিয়া উঠে। এই প্রকার অনেক প্রস্তরখণ্ড সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; পৃথিবী শ্রাবণ ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তি হইয়া যখন সেই প্রস্তরগুলির পথে গিয়া পড়ে তখন বায়ুর সহিত তাহারা এত বেগে ঘর্ষিত হয় যে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া সাদা হয় এবং পৃথিবীতে আসিতে না আসিতে একেবারে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সময়ে সময়ে কতকগুলি একেবারে না গলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই সকল প্রস্তরে টিন, লোহ, গন্ধক, ইত্যাদি পদার্থ থাকে। এই প্রস্তরের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ লক্ষ্য করিয়া এক প্রকার গণনার দ্বারা পৃথিবী হইতে বায়ু-সীমার দূরত্ব অনুমান করা যায়। এই গণনা অনুসারে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, বায়ু পৃথিবী হইতে ৫০ ক্রোশ (১০০ মাইল) উচ্চেও আছে।

এখন বায়ুর ভার কত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। একদিকে ভারা-

কর্ষণ শক্তিদ্বারা বায়ু আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছে। অন্যদিকে উপরের বায়ু নীচের বায়ুকে চাপিতেছে; সুতরাং পৃথিবীর চারিদিকের বায়ুর ভার অল্প নহে। যে সকল স্থান সমুদ্রের সমতলবর্ত্তী তাহার প্রত্যেক এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া জায়গার উপর ৭৷৷০ সের বায়ুর চাপ পড়িতেছে। এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া এক টুকরা কাগজের উপরেও ৭৷৷০ সের বায়ুর চাপ পড়িতেছে। তোমরা এখন বলিতে পার যে কাগজের উপর যদি এতটা চাপই পড়ে তবে, তাহা তুলিবার সময় সে চাপ আমরা বোধ করি না কেন? তাহার কারণ রবরের মত বায়ু স্থিতিস্থাপক। ভারাকর্ষণ শক্তি যেমন বায়ুকে নীচের দিকে টানিতেছে, স্থিতিস্থাপকতা গুণে তেমনি ভারাকর্ষণের হাত ছাড়াইয়া বায়ু উপরে উঠিতেছে; সুতরাং বায়ুর নীচের উপরের ও চারিদিকের চাপ সমান রহিয়াছে বলিয়া একখণ্ড কাগজ তুলিতে আমাদের কিছুই ভার বোধ হয় না। কাগজখণ্ড টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিলেও তাহার নীচে কতকটা বায়ু থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই কাগজ তুমি জলে ভিজাইয়া সেই খানে রাখ, আর কাগজের মাঝখানটা ধরিয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা কর তত সহজে তুলিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে, জল থাকাতে কাগজের নীচে বায়ু থাকিতে পায় না, এবং বায়ুর ৭৷৷০ সের ভার ইহাকে নীচের দিকে চাপিয়া রাখে। পূর্ণায়তন মানুষের শরীর কত বড়, তাহাতে না জানি কত মণ বায়ুর চাপ পড়িতেছে, কিন্তু মনুষ্যের শরীরের মধ্যে যে সকল বাষ্প ও তরল পদার্থ আছে তাহারা ক্রমাগতই বাহিরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বায়ুর চাপ ও মনুষ্যের শরীরের চাপ সমান থাকে। সকলেই জানেন নিশ্বাসের দ্বারা শরীর পূর্ণ করিলে আমাদের দেহ অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। ১৮৬২ অব্দে গ্লেসার নামক এক ইংরাজ বেলুনে করিয়া পৃথিবী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উঠিতেই তাঁহার শরীরের শিরা সকল ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ তাঁহার শরীরের আভ্যন্তরিক বাষ্প ও তরল পদার্থ বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল অথচ উপরকার বায়ু লঘু হওয়াতে তাঁহার শরীরে যথেষ্ট চাপ পড়িতেছিল না। পৃথিবীর নিকটে থাকিলে বায়ুভারের চাপে আমাদের শিরা ফুলিয়া উঠিতে পারে না। স্থিতিস্থাপকতা গুণে উপরের দিকেও যে বায়ু সবলে চাপ দিতেছে, তাহার একটা সহজ উদাহরণ দিই। একটী গ্লাস জলে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর একটি তাসের
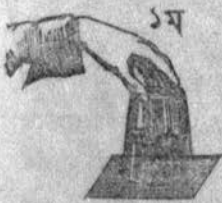
মত মোটা কাগজ রাখ। গ্লাস উল্টাইয়া ফেলিলেও কাগজ তাহার মুখ হইতে পড়িবে না। বায়ুর যে চাপ উচ্চে উঠিতেছে, তাহাই তাহাকে পড়িতে দিবে না। অদৃশ্য বায়ুর ভার আমরা কি উপায়ে জানিতে পারি তাহা ক্রমে বলিতেছি। U-আকারের একটী কাঁচের নলের অর্দ্ধেকটা জলে ভরিলে তাহার দুই বাহুতেই সমান উচ্চে জল উঠিবে। কারণ বায়ুর চাপ তাহার দুই বাহুতেই

সমান পড়ে। এক বাহুর মুখ অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া নল আড় করিয়া জল অঙ্গুলির কাছ পর্য্যন্ত আনিয়া যদি ইহাকে পুনর্ব্বার সোজা করিয়া ধর, তাহা হইলে পূর্ব্বে দুই বাহুতেই যেরূপ সমান জল দাঁড়াইয়াছিল তেমন আর দেখা যাইবে না—যে বাহুতে আমার অঙ্গুলি আছে তাহাতেই সমস্ত জলটা উঠিবে তাহার কারণ এই যে আঙ্গুলের দ্বারা রুদ্ধ থাকাতে একটা বাহুতে বায়ুর চাপ পড়ে না আরেকটা বাহুতে পড়ে। এই সহজ

উপায় অবলম্বন করিয়া বায়ুর মাপযন্ত্র প্রস্তুত হয়—তাহার দ্বারা আমরা সচরাচর বায়ুর চাপ জানিতে পারি।

হেঁয়ালি নাট্য।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রামের পথ।

(চতুর্ভুজ বাবু এম-এ পাস করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন। মনে করিয়াছেন গ্রামে হুলস্থুল পড়িবে। সঙ্গে একটি মোটাসোটা কাবুলি বিড়াল আছে।)

নীলরতনের প্রবেশ।

নীল। এই যে চতু বাবু, কবে আসা হল ?

চতু। কালেজে এম্-এ একজামিন্ দিয়েই—

নীল। বা বা, এ বেড়ালটিত বড় সরেশ !

চতু। এবারকার একজামিনেশন ভারি—

নীল। মশায়, বেড়ালটি কোথায় পেলেন ?

চতু। কিনেছি। এবারে যে সব্‌জেক্ট্‌ নিয়েছিলুম—

নীল। কত দাম লেগেছে মশায় ?

চতু। মনে নেই। নীলরতন বাবু আমাদের গ্রামের থেকে কেউ কি পাশ হয়েছে ?

নীল। বিস্তর। কিন্তু এমন বেড়াল এ মুল্লুকে নেই।

চতু। (স্বগত) আ মোলো, এ যে কেবল বেড়ালের কথাই বলে—আমি যে পাস ক'রে এলুম সে কথা যে আর তোলে না।

জমিদার বাবুর প্রবেশ।

জমি। এই যে, চতুর্ভুজ, এতকাল কলকাতায় বসে কি করলে বাপু?

চতু। আজ্ঞে এমে দিয়ে আস্‌চি।

জমি। কি বল্লে? মেয়ে দিয়ে এসেছ? কাকে দিয়ে এসেছ?

চতু। তা নয়—বি-এ দিয়ে—

জমি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? তা' আমরা কিছুই জান্‌তে পারলেম না?

চতু। বিয়ে নয়—বি-এ—

জমি। তবেই হল। তোমরা সহরে বল বি-এ, আমরা পাড়াগাঁয়ে বলি বিয়ে। সে কথা যাক্। এ বেড়ালটি তোফা দেখ্‌তে!

চতু। আপনার ভ্রম হয়েছে; আমার—

জমি। ভ্রম কিসের—এমন বেড়াল তুমি এ জেলার মধ্যে খুঁজে বের কর দেখি!

চতু। আজ্ঞে না, বেড়ালের কথা হচ্চে না—

জমি। বেড়ালের কথাইত হচ্চে—আমি বল্‌চি এমন বেড়াল মেলে না।

চতু। (স্বগত) আ খেলে যা!

জমি। বিকেলের দিকে বেড়ালটি সঙ্গে ক'রে আমাদের ওদিকে একবার যেও। ছেলেরা দেখে ভারি খুসি হবে।

চতু। তা হবে বৈ কি—ছেলেরা অনেক দিন আমাকে দেখে নি।

জমি। হাঁ—তা ত বটেই—কিন্তু আমি বল্‌চি, তুমি যদি যেতে না পার ত বেড়ালটা বেণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিও—ছেলেদের দেখাব। (প্রস্থান)

সাতুখুড়োর প্রবেশ।

সাতু। এই যে, অনেক দিনের পর দেখা!

চতু। তা আর হবে না! কতগুলো একজামিন্—

সাতু। এই বেড়ালটি—

চতু। (সরোষে) আমি বাড়ি চল্লেম। (প্রস্থানোদ্যম)

সাতু। আরে শুনে যাও না—এ বেড়ালটি—

চতু। না মশায়, বাড়িতে কাজ আছে।

সাতু। আরে একটা কথার উত্তরই দাওনা—এ বেড়ালটি—

(কোন উত্তর না দিয়া হন্‌হন্ বেগে চতুর্ভুজের প্রস্থান)

সাতুখুড়ো। আ মোলো! ছেলেপুলেগুলো লেখাপড়া শিখে ধনুর্দ্ধর হয়ে ওঠেন! গুণ ত যথেষ্ট—অহঙ্কার চারপোয়া!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চতুর্ভুজের বাটির অন্তঃপুর।

দাসী। মাঠাকরুণ, দাদাবাবু একেবারে আগুণ হয়ে এসেচেন!

মা। কেন রে?

দাসী। কি জানি বাপু!

চতুর্ভুজের প্রবেশ।

ছোটছেলে। দাদা বাবু, এ বেড়ালটি আমাকে—

চতুর্ভুজ। (তাহাকে এক চপেটাঘাত) দিন রাত্রি কেবল বেড়াল, বেড়াল বেড়াল!

মা। বাছা সাধে রাগ করে! এত দিন পরে বাড়ি এল, ছেলেগুলো বিরক্ত করে খেলে। যা, তোরা সব যা! (চতুর্ভুজের প্রতি) আমাকে দাও বাছা—দুধভাত রেখে দিয়েছি, আমি তোমার বেড়ালকে খাইয়ে আন্‌চি।

চতু। (সরোষে) এই নাও মা, তোমরা বেড়ালকেই খাওয়াও, আমি খাবনা, আমি চল্লেম।

মা। (সকাতরে) ও কি কথা! তোমার খাবার ত তৈরি আছে বাপ, এখন নেয়ে এলেই হয়।

চতু। আমি চল্লেম—তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর—এখানে গুণবানের আদর নেই! (বিড়ালের প্রতি লাথি বর্ষণ)

মাসি মা। আহা ওকে মেরো না—ও ত কোন দোষ করেনি!

চতু। বেড়ালের প্রতিই যত তোমাদের মায়া মমতা—আর মানুষের প্রতি একটু দয়া নেই!

(প্রস্থান।)

ছোট মেয়ে। (নেপথ্যের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) হরি খুড়ো, দেখে যাও, ওর ন্যাজ কত মোটা!

হরি। কার?

মেয়ে। ঐ যে ওর!

হরি। চতুর্ভুজের?

মেয়ে। না, ঐ বেড়ালের।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(ব্যাগ হস্তে চতুর্ভুজ। সঙ্গে বিড়াল নাই।)

সাধুচরণ। মশায়, আপনার সে বেড়ালটি গেল কোথায়!

চতুর্ভুজ। সে মরেছে।

সাধু। আহা, কেমন করে মোলো?

চতু। (বিরক্ত হইয়া) জানিনে মশায়!

(পরাণ বাবুর প্রবেশ)

পরাণ। মশায়—আপনার বেড়াল কি হল?

চতু। সে মরেচে।

পরাণ। বটে! মোলো কি করে!

চতু। এই তোমরা যেমন করে মরবে। গলায় দড়ি দিয়ে!

পরাণ। ও বাবা, এযে একেবারে আগুণ!

(চতুর্ভুজের পশ্চাতে ছেলের পাল লাগিল। হাততালি দিয়া "কাবুলি বিড়াল" "কাবুলি বিড়াল" বলিয়া খেপাইতে লাগিল।)

চতুর্ভুজ। (অত্যন্ত গরম হইয়া) বত সব quadrulateral quadruped quadrumana! কোন পুরুষে কালেজে পড়েচিস্! quadrumana কাকে বলে জানিস্?

ভিড়ের মধ্য হইতে হরিখুড়ো। জানি, quadrumana হচ্চে চতুর্ভুজ!

গত বারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "মার পিট" ও প্রবাদ প্রশ্নের উত্তর "যত হাসি তত কান্না"। অনেকেই উত্তর দিয়াছেন—স্থানাভাববশতঃ কেবল কয়েক-জনের নাম দিলাম।

শ্রীমতী মিহিরকুমারী মজুমদার। কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র। বাবু দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বাবু ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। বাবু কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বাবু কালিকাচরণ রায়। বাবু আশুতোষ দত্ত। বাবু জ্যোতীন্দ্রমোহন বসু। বাবু চারুচন্দ্র দত্ত।

মূল্য প্রাপ্তি।

মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাঃ দিনাজপুর ২৲
বাবু তারণচন্দ্র দাস রাওলপিণ্ডি ২৲
" রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিশোরগঞ্জ ২৲
" তারাকিশোরগুপ্ত শ্রীহট্ট ২৲
শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার পাবনা ২৲
বাবু কেশবলাল ঘোষ মাধবকাটী ২৲
" সৌরেশচন্দ্র সরকার কির্ণহার ২৲
" ললিতমোহন বক্সী ময়মনসিংহ ২৲
" সাধুচরণ রক্ষিত কলিকাতা ২৲
" যোগেন্দ্রলাল মিত্র ঐ ২৲
" অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী কুড়িয়াপাড়া ২৲
" গিরিধর সাহা সাহাপুর ১৲
" কেদারনাথ নন্দী ময়মনসিংহ ১৲
" চণ্ডীচরণ রায় কাছাড় ১৲
" ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় গাজীপুর ২৲
" ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধুবড়ী ১॥০
" গৌরগোবিন্দ সাহা শাঁখারিপাড়া ২৲
কুমার শ্রীবিপ্র নারায়ণ কুচবেহার ২৲
বাবু গৌরমোহন চন্দ্র কলিকাতা ২৲
" নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲
" শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲
" বামাচরণ রায় ময়মনসিংহ ২৲
" সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জামালপুর ॥০
K. M. Chatterjie Esq. ভবানীপুর ২৲
বাবু শিবচন্দ্র শীল চুঁচড়া ২৲
" রাজেন্দ্রনাথ দত্ত রায়না ২৲
" বিপিনচন্দ্র চৌধুরী নাজিরাতাঁড়ী ১৲
" মহেন্দ্রনাথ রায় হাবড়া ২৲
" শরৎচন্দ্র দে কণ্টাই ২৲
" রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲

বাবু তারকনাথ হালদার দেউলিয়া ১৲
" রাধাগোবিন্দ পাল নারায়ণগড় ২৲
" নীলাম্বর দাস ঢাকা ২৲
" নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত শিলচর ২৲
" নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲
" ক্ষেত্রমোহন বসু ঐ ১৲
" দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী জুনিয়াদহ ২৲
" কানাইলাল দে বাগবাজার ॥০
" সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জামালপুর ॥০
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র গৌরনগর ১৲
বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় চোরাড়া ২৲
সেক্রেটরি, ষ্টুডেণ্টস্ ক্লব ফরিদপুর ২৲
কুমার রমেশচন্দ্র সিংহ কলিকাতা ২৲
বাবু মানসরঞ্জন সেন গুপ্ত ঐ ২৲
শ্রীমতী সুখময়ী দাসী মালদহ ২৲
বাবু রমেশচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম ২৲
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ॥০
" অন্নদাচরণ গুহ ঐ ২৲
" কিশোরলাল দত্ত ঐ ২৲
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ॥০
শ্রীমতী শৈলবালা সেনজায়া দাসপাড়া ২৲
বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘটক দিনাজপুর ২৲
" শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায় ধুলিয়ান ২৲
" মাধবচন্দ্র রায় জলপাইগুড়ি ২৲
" কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আলিগড় ২৲
" শ্রীশচন্দ্র বসু মীরট ২৲
" তারকানাথ মৈত্র বোয়ালিয়া ২৲
" বসন্তকৃষ্ণ বসু বাঁকুড়া ২৲
" ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় নাটুদহ ১৲
" জগদীশ্বর গুপ্ত বাগেরহাট ২৲

নাম	স্থান	টাকা
বাবু শরচ্চন্দ্র সেন	বাঁকিপুর	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত	হাবড়া	১৲
„ ললিতমোহন সিংহ	বাঁশবেড়ে	২৲
শ্রীমতী সুপ্রভাসুন্দরী দেবী	রাঁচি	২৲
বাবু শরচ্চন্দ্র আঢ্য	কলিকাতা	২৲
„ পুলিনচন্দ্র রায়	ঐ	২৲
„ অম্বিকাচরণ মজুমদার	কুচবেহার	১৲
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ লাহা	ঐ	২৲
„ নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চক্রধরপুর	২৲
শ্রীমতী সরোজিনী দাসী	রঙ্গপুর	২৲
বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
„ গোপালচন্দ্র পাইন	ঢাকা	২৲
শ্রীমতী মনোমোহিনী কর	শ্রীহট্ট	২৲
„ ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী	ধুবড়ি	২৲
বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	২৲
„ হরিমোহন দে	বেরুচি	২৲
„ কেদারনাথ মিত্র	কটক	২৲
„ আনন্দবিহারী বসু	কুচবেহার	২৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র গুহ	ঐ	২৲
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	শ্যামনগর	২৲
„ আশুতোষ রায়	বরিশাল	১৲
„ ব্রজকুমার নিয়োগী	গয়া	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র দে	কলিকাতা	২৲
„ নারায়ণদাস দত্ত	ঐ	১৲
„ শশধর ভাদুড়ী	পাবনা	১৲
„ রাইচরণ কাঞ্জিলাল	কলিকাতা	২৲
„ হেমন্তনাথ মহলানবীশ	ঢাকা	২৲
„ সতীশচন্দ্র সেন	কলিকাতা	১৲
„ ইন্দুভূষণ দত্ত	দত্তপুকুর	২৲
„ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	খুলনা	২৲
বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষ	খুলনা	২৲
„ ব্রজলাল ঘোষ	ঐ	১৲
„ ত্রিগুণাচরণ দাস	ঐ	১৲
„ কালীকুমার ঘোষ	বাঘাটিয়া	১৲
„ বনমালী পাল	চুঁচড়া	১৲
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
„ কৈলাসচন্দ্র সিমলাই	মেদিনীপুর	২৲
„ অমরপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	কালিঘাট	২৲
„ জয়চন্দ্র সরকার	ঢাকা	২৲
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৲
„ শশীভূষণ সিংহ	কণ্টাই	২৲
„ রাজেন্দ্রলাল শীল	কলিকাতা	১৲
„ বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ ফকিরচাঁদ দাস	ঐ	১৲
„ নিলমণি মল্লিক	ঐ	১৲
„ সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ যদুনাথ গুহ	ঐ	১৲
„ রজনীভূষণ রায়	কটক	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ নন্দী	শ্রীহট্ট	২৲
„ যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোঃ	কলিকাতা	২৲
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৲
„ শশিভূষণ ঘোষাল	ঐ	১৲
„ প্যারিলাল বসু	ঐ	১৲
„ গোপালচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	২৲
„ জগদিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৲
„ উপেন্দ্রনাথ বাগচি	ভাগলপুর	২৲
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	হাবড়া	৪৲
„ গুরুপ্রসন্ন ঘোষ	কলিকাতা	২৲
„ সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	ঐ	২৲
„ গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরী	মহিয়াড়ি	২৲
„ শর্ব্বরীনাথ মল্লিক	আন্দুল	২৲

বোম্বাই সহর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জনসংখ্যা। } বোম্বাই সহর এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা তাহার পূর্ব্বোত্তর জনসংখ্যার তুলনা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইবে। যখন বোম্বাই দ্বীপ প্রথমে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয় তখন বসতির হিসাবে উহা এক সামান্য পল্লী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দশসহস্র লোকের আবাস স্থানকে আর সহরের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কিন্তু এই জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে; ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বাসীর সংখ্যা ,১৬০০০; শতাব্দী পরে তাহা দেড় লক্ষেরও অধিক। ১৮৭২ অব্দে যে লোকসংখ্যার তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ ৬লক্ষ ৪৪ হাজার ও ১৮৮১র তালিকায় ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার নির্ণীত হইয়াছে। অতএব দেখ ১০ বৎসরের মধ্যে বোম্বায়ের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই দশাব্দীর মধ্যে কলিকাতায় জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। লোকসংখ্যা অনুসারে বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন সহরের পরস্পর দশবৎসরের তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, বোম্বাই বৃদ্ধিশীল—মান্দ্রাজ হ্রাসোন্মুখ, কলিকাতা নিশ্চলা। বোম্বায়ের এই বিপুল প্রজাপুঞ্জ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিচিত্র বর্ণ বিচিত্র জাতির সম্মিশ্রণে সংগঠিত। হিন্দুদের মধ্যে গুজরাতী বণিক ও মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ রীতি চরিত্রে কেমন ভিন্ন। মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় মুসলমান একদিকে—অন্যদিকে পাঠান তুরক আরব পারস্য প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। তদ্ভিন্ন ইহুদী পোর্টুগীস আরমানী পারসী, এই সমস্ত জাতি এই বিচিত্র জনতার অন্তর্ভূত। বোম্বায়ে যে সকল জাতি সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ বলিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে—বাছিয়া বাছিয়া সংক্ষেপে যথাসাধ্য বর্ণনা করা যাইতেছে।

জৈন } জৈনসম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করা যাক্‌। সমুদায় ভারতবর্ষে জৈনসংখ্যা বিশলক্ষ * বলিয়া প্রসিদ্ধ—বোম্বাই দ্বীপে প্রায় ১৮০০০। জৈনদের

* এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। পালিতানার ঠাকুর কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া জৈনেরা ঠাকুরের বিপক্ষে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করে সেই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জৈনসংখ্যা বিশলক্ষ বলিয়া কথিত হয় কিন্তু হন্টর সাহেব কৃত Gazetteer-এ তাহার চতুর্থাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রধান আড্ডা গুজরাত—তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসাদার ও শ্রীমন্ত। জৈনধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে মিশ্রিত, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ভাগ উহার সঙ্গে অনুস্যূত। বৌদ্ধদের মত জৈনেরা নিরীশ্বরবাদী অর্থাৎ জগতের আদিকারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেনা। কিন্তু জৈনদের শাস্ত্রোক্ত মত যাহাই হউক, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহারা ঘোর পৌত্তলিক; ঈশ্বরারাধনার পরিবর্ত্তে জৈন ধর্ম্মে বীর-পূজা স্থান পাইয়াছে। কর্ম্মের প্রাধান্য বৌদ্ধ জৈন উভয় ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়। উভয়েই আপন আপন কর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও স্বর্গ নরক ভোগ বিশ্বাস করে। যে সকল সাধু পুরুষ স্বকীয় কর্ম্মগুণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জিন—জিনের অনুচর জৈন। জিনের অপর নাম তীর্থঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪জন তীর্থঙ্কর উদয় হইয়াছেন ও ভাবিযুগে ২৪জন উদয় হইবেন। জৈন মন্দিরে এই সকল তীর্থঙ্করের পাষাণময় বিশাল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ জিনদ্বয়, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পূজার্হ। বাঙ্গলাদেশে পার্শ্বনাথ, কাঠেওয়াড়ে গিরনার ও শত্রুঞ্জয়—উত্তর গুজরাতে আবুর পাহাড় ইত্যাদি জৈন তীর্থ ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত। পালিতানার অধীনস্থ শত্রুঞ্জয় ইহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে বহুমূল্য সুন্দর জৈন মন্দির সকল প্রত্যক্ষ করা যায়। মন্দিরের মধ্যে আদিনাথ ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের শান্তিপূর্ণ গম্ভীর পাষাণ মূর্ত্তি রজত দীপালোকে আলোকিত হইয়া অনভিব্যক্ত অস্ফুট কান্তি ধারণ করে; ধূপধূনার গন্ধে বায়ু সুবাসিত; জৈনতপস্বিনীগণ স্বর্ণরঞ্জিত লোহিত বসন পরিধান পূর্ব্বক সুচিক্কণ পাষাণের উপর দিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে গান করিতে থাকে।

বৌদ্ধদের মত জৈনদের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ এ ধর্ম্মের উপদেশ। প্রাণীর কষ্ট নিবারণ উদ্দেশে জৈনগণ প্রভূত কষ্ট অর্থব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাহাদেরই যত্ন ও ব্যয়ে বোম্বায়ে পশুর হাঁসপাতাল (পিঞ্জরাপোল) স্থাপিত ও সুরক্ষিত। পাছে দীপানলে কীট পতঙ্গ বিনষ্ট হয় এই হেতু সূর্য্যাস্ত পরে জৈনদের আহার নিষেধ। অনেক জৈন সম্প্রদায়ী এই অহিংসা ধর্ম্মের অতিমাত্র কঠোর নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া চলে। বর্ষার চতুর্ম্মাস কীট পতঙ্গের সমধিক প্রাদুর্ভাব এই কারণে কোন কোন জৈনগৃহে রাত্রে দীপালোকের কিরণমাত্রও দৃষ্টি হয় না। কোন কোন স্থানে ঐকালে কলুর ঘাণি কুম্ভারের চাক বন্ধ। কথিত আছে এই অতিমাত্র অহিংসা নিয়ম জৈনদের রাজ্যনাশের মূল। অম্বলবাড়ার শেষ রাজা কুমার পাল একজন গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে জীবহিংসা ভয়ে তিনি নিজ সৈন্য সামন্তের গতিবিধি নিবারিত করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন।

জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখা মাত্র কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতেরা অস্বীকার

করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। একজন † মাননীয় লেখকের মত এই যে অশোক রাজা প্রথমে জৈন ছিলেন, রাজত্বের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন; অশোক রাজার অনুশাসন-লিপি হইতে তিনি স্বীয় মত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জৈনেরা নিজে তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমত ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের অগ্রাহ্য। ইতিহাসে পাওয়া যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনদের উন্নতি। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্ব্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়—মহীশূর, আবু, বিজয়নগর প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে। কাযতী মাদুরা পাণ্ড্যরাজ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পতন হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ব্বে গুজরাতে বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার ছিল, খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তথায় জৈন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সে যাহা হউক, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক—উভয়কে পরস্পরের জাতিভাই বলিয়া মানিতেই হইবে। বীরপূজা ও অপর কতকগুলি বিশেষ বিধানে বোধ হয় যেন সার্ব্বভৌমিক বৌদ্ধধর্ম্ম জৈন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু বোম্বায়ের হিন্দুগণ শৈব ও বৈষ্ণব সামান্যতঃ এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারে। কোন হিন্দু শৈব কি বৈষ্ণব তিলক দেখিলেই অক্লেশে জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবেরা নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর পদাঙ্কসূচক উর্দ্ধরেখা করেন আর শৈবেরা ললাটের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটি রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে উর্দ্ধ পুণ্ড্র ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুণ্ড্র বলে।

শঙ্করাচার্য্য শৈবদের গুরু জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য একজন প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন মহোৎসাহী ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জাতিগতই হউক ব্যক্তিগতই হউক, ইতিহাস মাত্রই এরূপ অযত্নের বস্তু যে এমন লোকের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত কালের সহিত বিলীন হইয়াছে। আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঙ্করচার্য্যের চরিত বর্ণনা আছে বটে কিন্তু তাহা এত অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত যে সত্য মিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। তাঁহার জীবনচরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহার সারাংশ এই। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কেরল (মালাবার) প্রান্তে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। অনধিক কালের মধ্যেই তিনি একটী তেজীয়ান্ ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া উঠিয়া-

---

† Thomas on Jainism or the Early faith of Asoka.

ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভারত-ভূমির অন্তর্গত নানা দেশ ভ্রমণ ও সে সময়ের প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করেন। তিনি কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জীবনের শেষ-ভাগে কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতীপীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বারিদকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে হিমালয়-স্থিত কেদারনাথে গিয়া ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রাণত্যাগ করেন। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহীশূরস্থ শৃঙ্গ গিরির মঠ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শৃঙ্গ গিরি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মস্থান ও বিভাণ্ডক ঋষির তপোভূমি বলিয়া প্রখ্যাত, শৃঙ্গ গিরি মঠাধিপতি শঙ্করাচার্য্যের অনু-শাসন এ অঞ্চলে শৈবদের মধ্যে প্রচলিত। শৃঙ্গ গিরি হইতে তিনি জাতি সম্বন্ধীয় বিহিত বিধান প্রচার করেন। সমাজ সংস্কর্ত্তা গণ তাঁহার সহযোগিতা পাইবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহার মানমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। যখন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন শৃঙ্গগিরি হইতে শিষ্যবর্গের মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া যান।

শঙ্করাচার্য্য জীবব্রহ্মে অভেদমূলক অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি বেদান্ত দর্শন, উপনিষদ ভাষ্য, ভগবদ্গীতা ভাষ্য—ইত্যাদি আত্মজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রস্তুত করেন। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার প্রকৃত মত ও নির্গুণ উপাসনা প্রচার করা এই সমস্ত মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য কিন্তু দেখা যায় সাকার দেবতার উপাসনায় তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। এই সকল উচ্চ উপদেশ অজ্ঞান জনসাধারণের ধারণাতীত তাহ তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যাহারা নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী তাহাদের জন্য তিনি সুলভ মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই দেখি যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাশ করে। তাঁহার নাম যথার্থ স্থাপক। লিখিত আছে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেকেই শিব পক্ষপাতী ও শিবোপাসক দৃষ্ট হয়। শৈবেরাই শঙ্করাচার্য্যকে আচার্য্যপদে বিশিষ্টরূপে বরণ করেন—এমন কি, শঙ্করের অবতার বলিয়া তাঁহাকে দেবাসনে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণবেরা দ্বৈতবাদী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের আচার্য্যও বিভিন্ন।

বল্লভাচার্য্য — কিন্তু বোম্বাই ও গুজরাতে বল্লভাচার্য্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। বহুতর স্বর্ণ বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী। শিষ্যদের উপর গোঁসাইদের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখা যায়। বল্লভাচার্য্যের উত্তরাধিকারী আচার্য্যগণ সগর্ব্বে 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর ন্যূনাধিক অশীতি বৎসরে বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত সম্বন্ধে নানা অলোকিক কাহিনী